ফাল্গুন
১৩৮০

ছোটদের
সচিত্র
মাসিক
পত্রিকা

গল্প ☆ উপন্যাস ☆ কবিতা ☆ প্রবন্ধ ☆ খেলাধুলা ☆ বিজ্ঞান ☆ ধাঁধা ☆ প্রতিযোগিতা

লীলা মজুমদার
ও সত্যজিৎ রায়
সম্পাদিত

ছেলেমেয়েদের
সচিত্র
মাসিকপত্র

সন্দেশ

সম্পাদক
লীলা মজুমদার
সত্যজিৎ রায়

সূচীপত্র | ফাল্গুন | ১৩৮০

গৌরী ধর্মপাল—**গোলকুটির গল্প** ৬৪৫
প্রভাত চন্দ্র গুপ্ত—**সন্তোষের ঝাঁপি** ৬৪৬
বারীন বসু—**আকাশের বুকে চল উড়ে** ৬৫২
সত্যজিৎ রায়—**একশৃঙ্গ অভিযান** ৬৫৩
ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়—**লিমেরিক** ৬৬১
সায়নদেব মুখোপাধ্যায়—
ছোট্ট কালো সোনার ছেলে ৬৬২
অরুণ দে—**ছোটদের বন্ধু টমাস** ৬৬৩
অজেয় রায়—**কেল্লা পাহাড়ের গুপ্তধন** ৬৬৫
লীলা মজুমদার—**গল্পসল্প** ৬৭১
সোনা মুখার্জি—**বিচিত্র দণ্ড** ৬৭৩
জীবন সর্দার—**প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর** ৬৭৪
—**চিঠিপত্র** ৬৭৭
—**ধাঁধা** ৬৭৮
অজয় হোম—**খেলাধুলা** ৬৮১
—**হাত পাকাবার আসর** ৬৮৪

পরীক্ষা প্রতিযোগিতার ফলাফল

প্রথম পুরস্কার—২০৪০ সন্দীপন দেব, বারো টাকা এবং একটি বিশেষ পুরস্কার।

২১৯৪ মনামী ও অনামী রায়—দুটাকা।

৬০০ দীপঙ্কর বিশ্বাস—দেড় টাকা।

প্রত্যেকে এক টাকা করে—৩২৯ কিশলয় ঘোষ, ৩৪৮ কৃষ্ণা বসু, ৪৬৬ স্বাগতা মিত্র, ৬০১ পার্থ ভট্টাচার্য, ১০৯৫ কৌশিক মুখার্জি, ১৩৭১ প্রদীপ কুমার রায়, ১৮৬৩ সোনালী লাহিড়ী, ২২৪৭ দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—যদি কারো নাম বাদ পড়ে থাকে, অবিলম্বে জানাও।

ফাল্গুন ১৩৮০ | মার্চ ১৯৭৪

গোলকুটির গল্প

গৌরী ধর্মপাল

টগরের মগডালে কাক আর কাকী-মা
দুজনে বেঁধেছে বাসা
কুটোকুটি দিয়ে খাসা
খোকা বলে, সারাদিন বসে চেয়ে থাকি-না
টগরের গা-টা ধরে হাওয়া দেয় ঝাঁকি যেই
দুলে ওঠে গোলকুটি
দেখা যায় গুটিসুটি
নীল নীল ডিম কটি, বেশি দিন বাকি নেই।
কাক বাবা সারাদিন কি যে করে জানি না
ওড়ে বসে বসে ওড়ে
খালি খালি কা কা করে
ঠায় বসে গা ডুবিয়ে তা-ই দেয় কাকা-মা।
আজ গিয়ে কাল গিয়ে যেই হবে বৈশাখ
ওমনিই ডিম ফুটে
বের হবে গুটগুটে
গোটা তিন রোঁয়া রোঁয়া খোকা-কাক খুকু-কাক।
ধাড়িদের দেখেশুনে খোকাবাবু হন্যে
কাকখোকাখুকুদের দেখবার জন্যে।
ভাবে, কী খাবে কী মানা
চেঁচাবে কি চেঁচাবে না
জন্মেই ডিগবাজি খাবে কি না শূন্যে।
অবশেষে একদিন যা ভেবেছি তাই হল
মা-র তা-র জোরে ডিম ফেটে ফেটে ছা-ই হল।
খোকা বলে, এ কি মা
ডানা কেন দেখি না
চোখ কেন বোজা বোজা, দেখি কাছে যাই চল।
মা বলে, সবুর কর্, কিছুদিন যাক, তবে
পালক-টালক চোখ ডানা-টানা সব হবে।
উড়তে শিখবে ছানা
শিখবে খাবার আনা
চেঁচামেচি, নাচানাচি, তারপর একদিন
বাসা ফেলে উড়ে যাবে তেরে কেটে তাক ধিন।

সন্তোষের ঝাঁপি

প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

পারস্য দেশের গল্প

সে বহুকাল আগেকার কথা, তখন কত রকমের আশ্চর্য ঘটনাই ঘটত পৃথিবীতে! সেই যুগে পারস্য দেশে খুব বড় এক সদাগর ছিলেন, তাঁর নাম ছিল আবদুল্লা। তাঁর টাকাপয়সা ধনদৌলতের কূলকিনারা ছিলনা। এই অগাধ অর্থ দিয়ে তিনি কি করবেন বুঝে উঠতে পারতেন না। দুহাতে ছড়িয়েও তার কিছুই হত না। সংসারে তাঁর এক পরমাসুন্দরী স্ত্রী আর কয়েকটি ফুটফুটে ছেলেমেয়ে, কিন্তু তাঁর মনে সুখ ছিলনা। সর্বদাই অভাববোধ যেন আরো কিছু চাই! কিন্তু কি চাই তা তিনি নিজেই জানতেন না। তাই সব সময়েই তাঁর মেজাজ খিটখিটে আর মনে অশান্তি লেগে থাকত।

একদিন রাত্রে তিনি বিছানায় শুয়ে আছেন, একটু তন্দ্রার মতন এসেছিল—এমন সময়ে দেখলেন, এক অবাক কাণ্ড! ঘরের ভিতরকার একটা সিন্দুকের ডালা খুলে খুট খুট করে ভিতর থেকে এক থুরথুরে বুড়ি বেরিয়ে এল! বয়সের ভারে একেবারে কুঁজো হয়ে পড়েছে, সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না। একটা লাঠিতে ভর দিয়ে ঠক ঠক করে আস্তে আস্তে আবদুল্লার দিকেই বুড়ি এগিয়ে আসতে লাগল। তাঁর বিছানার কাছে এসেই দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর বলল—'আবদুল্লা, খোদাতাল্লা তোমাকে অনেক দিয়েছেন, তবু তোমার মনে সুখ নেই! তুমি এক কাজ কর না কেন? সন্তোষের ঝাঁপির সন্ধান কর তুমি, ঐটি পেলে পরেই তুমি সুখী হবে, তার আগে নয়।'

এই বলেই বুড়ি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। সদাগর বিছানায় উঠে বসে, চোখ রগড়ে, বারবার তাকালেন, কিন্তু বুড়ির আর দেখা নেই।

পরপর তিনরাত এই ঘটনা ঘটল! রোজই বুড়ি এসে আবদুল্লাকে একই কথা বলে। তিনদিনের দিন রাত্রে বুড়ি চলে যাবার পর সদাগর ভাবলেন যে বুড়ির কথার ভিতরে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু সত্য আছে।

'সন্তোষের ঝাঁপি' বলে কি বাস্তবিকই কোন জিনিস আছে? এই চিন্তা তাঁকে একেবারে পেয়ে বসল? শেষে এমন হল যে দুনিয়ার আর সব জিনিস তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হতে লাগল। 'সন্তোষের ঝাঁপি' না পেলে যেন জীবনই বৃথা, যে কারণেই হোক সেটা পাওয়া চাই!

আবদুল্লা জীবনে যখন যা চেয়েছেন, সবই পেয়েছেন। এখন এই সন্তোষের ঝাঁপি পাওয়ার জন্য তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বসলেন। কিন্তু কিভাবে পাওয়া যাবে?

সন্তোষের ঝাঁপি কোথায় পাওয়া যায় এই খবর জোগাড় করে আনবার জন্য তিনি দেশবিদেশে লোক পাঠালেন। ফিরে এসে দুএকজন খবর দিল যে, ঝাঁপির কথা তারা শুনেছে বটে কিন্তু কোথায় পাওয়া যায়, অনেক চেষ্টা করেও তার কোন হদিস পায়নি।

সদাগরের তখন দিনরাত ঐ এক চিন্তা ছাড়া আর কিছু নেই! ঝাঁপি নিয়ে তাঁর মন এত মেতে উঠল যে তাঁর আহার নিদ্রা বন্ধ হওয়ার যোগাড়! কোনো দিক থেকে কোন খবর না পেয়ে তিনি মুষড়ে পড়লেন। ভাবলেন, দুনিয়ায় কি এমন কেউ নেই যে এই ঝাঁপির সন্ধান দিতে পারে আর ঝাঁপি পাওয়ার পথ বাৎলে দিতে পারে। এমন লোক পেলে সে যা চায় তাই দেবেন, টাকাপয়সার অভাব কি তাঁর?

শেষে একদিন তাঁর আশা পূর্ণ হল। ঝাঁপির খবর নিয়ে একটি লোক এল। তাকে দেখলে কিন্তু মোটেই আস্থা হয় না—পথের ভিখারী, পরনে ছেঁড়া তালি দেওয়া কাপড়, সমাজের আস্তাকুড়ে তার বাস। সে বলল—'সদাগর মহাশয়, শুনলাম সন্তোষের ঝাঁপির সন্ধান আপনি চান। সব খবরই পাবেন এই গরিবের কাছে। ঝাঁপি আছে অনেক দূরে এক উপত্যকায়। আপনাকে আমি পথ দেখিয়ে ঠিক জায়গায় নিয়ে যাব। তবে মোটা রকমের বকশিস চাই। তাছাড়া পথে খরচপত্রের বহর কম নয়। খুব টাকা-পয়সাওয়ালা লোক ছাড়া সন্তোষের ঝাঁপির মালিক হওয়া যার তার কর্ম নয়। ঝাঁপির পাহারায় দিনরাত একদল দৈত্য মোতায়েন আছে। তাদের জন্য উট বোঝাই করে দামী দামী সওগাত সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে, নইলে তাদের বশ করা কঠিন।'

আবদুল্লা বললেন—'সে আমার পক্ষে কঠিন কি? দেশে আমার চেয়ে ধনী আর কে আছে? ও সবের জন্য তুমি কিছু চিন্তা কোরো না। আমার আর সবুর সয় না। তুমি আমাকে সেই উপত্যকায় নিয়ে চল। তাহলে দেখবে বাকি জীবনের জন্য তোমার কোন ভাবনা থাকবে না, পায়ের উপর পা তুলে আরামে কাটিয়ে দেবে।'

ভিখারী বলল—'এত তাড়াহুড়ো করলে কি কাজ হয়? আগে সওগাতগুলো সংগ্রহ করতে হবে, তাতে সময় লাগবে। তারপর, যে উপত্যকার কথা বলছি, সেখানে যেতে হবে আরবদেশের বিশাল মরুভূমি পার হয়ে। সেকি আর দুচারদিনের পথ? বেশ কিছুদিন লাগবে সেখানে পৌঁছতে।'

কিন্তু আবদুল্লা মরিয়া হয়ে উঠে পড়ে লাগলেন, নয় দিনের মধ্যে ভিখারীর কথামত সব বন্দোবস্ত তিনি করে ফেললেন। তারপর ঝাঁপির উপত্যকায় রওনা হয়ে পড়লেন। তিনি চললেন মণিমুক্তা খচিত এক রথে, দশটা ধবধবে সাদা ঘোড়া টানছে সেই রথ, সোনার লাগাম ঝুলছে তাদের পিঠে। একদল হাতিও চলল সঙ্গে। তাদেরও রকমারি সাজপোশাক, পিঠের উপর বাদ্যভাণ্ড, তার বাজনার শব্দে মরুভূমির একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলল। লোকে জানল—হ্যাঁ, সদাগরের মত সদাগর একজন চলেছেন বটে।

বাদ্যভাণ্ডের পিছনে হরেক রকমের ফলের ঝুড়ি নিয়ে চলল দুশো উট, তার পিছনে আরো দুশো উট, ধানের বোঝা চাপানো তাদের পিঠে, সেরা মদের পিঁপে নিয়ে চলল পাঁচশো উট আর সুগন্ধি আতর নির্যাস, মসলা, দামী পোশাক পরিচ্ছদ আর নানাধরণের উপহার উপচার নিয়ে যে চলল আরো কত উট, তার হিসেবই নেই। মরুভূমির পথে বেদুইন ডাকাতের ভয়, পথে যাতে উট চুরি না হয় তাই দলবলকে সামনে, পিছনে, দুপাশে ঘেরাও করে একদল লোক চলল অস্ত্র-শস্ত্র হাতে নিয়ে।

চারদিনের দিন তাঁরা থামলেন এক উপত্যকার এসে, তার একদিক থেকে শুরু হয়েছে খেজুর গাছের ঘন বন। এখানে এসেই আবদুল্লাকে রথ থেকে নেমে পড়তে বলল ভিখারী। উটের বাহিনী আর সঙ্গের দলবলকে পিছনে ফেলে রেখে তাঁরা পায়ে হেঁটে এগিয়ে চললেন, ভিখারী তাঁকে বনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে যেতে শেষে একটা গুহার সামনে এসে হাজির হল। গুহার মুখের কাছে আবদুল্লাকে বসতে ইসারা করে ভিখারী বলল—'আপনি এখানে অপেক্ষা করুন।' বলেই সে গুহার ভিতরে ঢুকল।

আবদুল্লা সেখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন। সূর্য অস্ত গেল, সন্ধ্যা হল, চারিদিক ঘিরে অন্ধকার নামল, তবু ভিখারীর ফিরে আসার নাম নেই! কি করবেন, সদাগর ভেবে পেলেন না। তাঁর মেজাজ বিগড়ে গেল, রাগে গা জ্বলতে লাগল। তিনি হলেন দশের একজন, ডাকসাইটে সদাগর, অন্যের আশায় পথ চেয়ে বসে থাকবেন, এ তাঁর ধাতে সইবে কি করে? শেষটা কোন উপায় না দেখে তিনি একটা গাছের উপর চড়ে বসলেন, রাতটা সেখানেই কাটাবেন ঠিক করলেন।

বসতে বসতে গাছের উপরেই এক সময়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন ঘুম ভাঙল ভোরবেলায়। চোখ কচলাতে কচলাতে চোখ খুলতে যাবেন তখন যেন আর তাকাতেই পারেন না, চারদিক থেকে কিসের ঝলমলে আলো তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে দিতে লাগল। ব্যাপার কি দেখতে গিয়ে সে এক অবাক কাণ্ড! দেখলেন, যে গাছের উপর তিনি বসে আছেন, সেটা একেবারে খাঁটি সোনার তৈরি, আর তার পাতাগুলো রুপোর, ঝলমল করছে রোদ লেগে! কৌতূহলের সঙ্গে এদিক ওদিক চোখ ফেরাতে গিয়ে,

নজরে পড়ল অল্পদূরেই এক রাজপ্রাসাদ, সোনা, রুপো আর নানারকম মণিমাণিক দিয়ে গড়া, সূর্যের আলো ঝিলিক মারছে তার উপরে আর রামধনুর সাতরঙের ঢেউ ঠিকরে পড়ছে সেখান থেকে। এমনটি সদাগর স্বপ্নেও দেখেননি কোনদিন

সদাগর গাছের উপর থেকে নামলেন। মাটিতে পা দিয়েই দেখলেন, সেত মাটি নয়, কেবল সোনার ধুলো আর মুক্তোর রেণু! আশেপাশে যত গাছ রয়েছে, সবগুলোই সোনা রুপোর। দেখে তিনি আপন মনেই চেঁচিয়ে উঠলেন—'এর কাছে ত আমার ধনরত্ন, সওগাত কিছুই লাগে না! দৈত্যরা হয়ত সে সব ছোঁবেও না। যাই হোক, একবার গিয়ে দেখতে হয়।'

মনে মনে ভাবলেন। ঐ সামনের প্রাসাদেই বোধহয় দেত্যেরা থাকে, তিনি সোনার পথের উপর দিয়ে সেই ঝলমলে প্রাসাদের দিকে রওনা হলেন। প্রাসাদের উপরে ছিল একটা প্রকাণ্ড সোনার গম্বুজ আর গম্বুজের নিচেই রুপো আর মুক্তোর দরজা। দরজাগুলো খোলাই ছিল আবদুল্লা ভিতরে ঢুকে পড়লেন। প্রাসাদের একটা বড় ঘরের ভিতর একজন বুড়ো লোক বসেছিলেন। তাঁর গায়ে যে ঝকমকে জরির পোশাক ছিল তার মত দামী পোশাক আবদুল্লা তাঁর জীবনে কখনও দেখেননি। একদল প্রহরী বুড়োর চারদিকে দাঁড়িয়েছিল, তাদের পোশাকও কম জমকালো না!

ঘরে লোক রয়েছে দেখে আবদুল্লা বেরিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেন। কিন্তু বুড়ো মনিবের ইঙ্গিতে একজন প্রহরী সদাগরকে সিংহাসনের কাছে যেতে ডাকল। আবদুল্লা ব্যস্ত হয়ে ছুটে গেলেন।

সিংহাসনের কাছে গিয়ে একেবারে মাটিতে মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করলেন।

সিংহাসনে বসেছিলেন বুড়ো খলিফা, এই প্রাসাদের মালিক। তিনি বললেন—আবদুল্লা, ভয় পেয়ো না, আমি তোমার বন্ধু। আমি জানি তুমি সন্তোষের ঝাঁপির সন্ধানে এসেছ আর নানা রকমের দামী দামী সওগাত সঙ্গে নিয়ে এসেছ। তুমি তোমার পুরস্কার নিশ্চয়ই পাবে।'

আবদুল্লা মনে মনে ভাবলেন, ইনি এসব কথা জানলেন কি করে? কিন্তু মুখে কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। ওঁর কাছ থেকে আর কিছু শুনতে পান কি না, তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

খলিফা একজন প্রহরীকে ডেকে বললেন—'যাও আবদুল্লাকে সঙ্গে নিয়ে যাও, দুনিয়ার ধন-দৌলতও ওকে একবার দেখিয়ে নিয়ে এস। আমার দৌলতখানার ঘরে ঘরে সদাগরকে নিয়ে যেও।'

প্রহরী আবদুল্লার হাতে ধরে তাঁকে রাজপ্রাসাদের অন্দরমহলের ঘরগুলোতে নিয়ে গেল। ঘর-গুলোর দেয়াল রুপোর তৈরি আর আর সব জানালাগুলো স্ফটিকের। চারদিকে রাশিরাশি সোনা, রুপো, মুক্তো ঢিপির মত উঁচু হয়ে আছে, ঘরের মেঝেতেও যে কত ছড়াছড়ি যাচ্ছে, তার হিসেব নেই, চলতে গেলেই পায়ে পায়ে মাড়িয়ে যেতে হয়।

এই রকমের অনেকগুলো ঘর পার হয়ে তাঁরা এক জায়গায় এসে পৌঁছলেন, সেখান থেকে এক ধাপ সিঁড়ি শুরু হয়েছে, সিঁড়িগুলো একেবারে পাতালপুরীর ভিতরে নেমে গেছে। প্রহরী আবদুল্লাকে সেই সিঁড়ি দিয়ে নিচে নিয়ে গেল। সিঁড়ির পর সিঁড়ি পার হয়ে তাঁরা একটা গুহার মুখে এসে পড়লেন। এখানে এসে প্রহরী থেমে দাঁড়াল, বলল—'এই গুহার ভিতরেই সন্তোষের ঝাঁপি লুকানো রয়েছে।'

শুনে আবদুল্লা আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিলেন আর কি! সামনের এই গুহার ভিতরে? এত কাছে সন্তোষের ঝাঁপি? এত সহজে, এত চট করে তিনি এসে পড়বেন, এ যে সদাগর কল্পনাও করতে পারেন নি। প্রহরী তখন জন দশেক লোককে ডেকে পাঠাল। তারা আসতেই বলল—'সন্তোষের ঝাঁপি রয়েছে যে সিন্দুকের ভিতরে। সেটিকে উঠিয়ে নিয়ে এসো।'

সিন্দুকটা এত ভারি ছিল যে, সেই দশজন লম্বা-চওড়া জোয়ান লোক তাকে টেনে তুলে আনতে একেবারে হিমসিম খেয়ে গেল। যাই হোক, অতি কষ্টে তারা সিন্দুকটি এনে আবদুল্লার পায়ের কাছে রাখল।

প্রহরী বলল—'আবদুল্লা, এই নাও তোমার পুরস্কার। আজ থেকে তুমি হলে এই সিন্দুকের মালিক। সিন্দুক নিয়ে এবার দেশে ফিরে যাও। সন্তোষের ঝাঁপি পেলে, এখন মনের সন্তোষ আর শান্তিতে সারা জীবন কাটিয়ে দাও। কিন্তু একটা বিষয়ে সাবধান করে দিচ্ছি—কখনো ভুলে যেও না যেন, নিজের বাড়িতে ছাড়া আর কোথাও সিন্দুক খুলে সন্তোষের ঝাঁপিটি বের করে আনবে না, আর যখন ঝাঁপি বের করবে তখন সব দরজা জানলা বন্ধ করে নিতে হবে।'

আবদুল্লার মনের আনন্দ আর ধরে না। তিনি সেই সিংহাসনের ঘরে ফিরে এলেন। এখনো সোনার সিংহাসনে খলিফা বসেছিলেন। আবদুল্লা যত সওগাত সঙ্গে এনেছিলেন, সব ঢেলে দিলেন

তাঁর পায়ের কাছে। আর যে ভিখারী তাঁকে পথ দেখিয়ে এনেছিল এই প্রাসাদে, সে ছিল বাইরে দাঁড়িয়ে, তাকে আবদুল্লা এত প্রচুর সোনা দিলেন যে সে রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেল।

সিন্দুকটিকে লম্বা বাঁশে বেঁধে চারটি উটের পিঠে চাপিয়ে দেওয়া হল। তারপর আবদুল্লা ফিরে চললেন বাড়ির দিকে। এবার আর পাহারা দেওয়ার জন্য বেশি লোক রইল না সঙ্গে।

মরুভূমির আগুনের হলকার ভিতর দিয়ে তাঁদের পথ। এই পথে তিনদিন চলার পর আবদুল্লার ছোটখাট দল একটা জলাশয়ের কাছে এসে পৌঁছল। আবদুল্লা বললেন—'আজ রাত্রের মত আমরা এখানেই তাঁবু ফেলব।' তিনি জানতেন যে জলের দেখা পাওয়া তাঁদের বরাতে আর কয়েকদিন নাও ঘটতে পারে।

তাঁবু খাটানো হল। সাবধানের মার নেই ভেবে আবদুল্লা সেই সিন্দুকের উপরেই শুয়ে পড়লেন ঘুমোবার জন্য। কিন্তু তিনি কিছুতেই মনে শান্তি পাচ্ছিলেন না। সন্তোষের ঝাঁপিটা দেখতে কেমন, ঝাঁপির গুণ কি, এসব কথা জানবার জন্য তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। কি আছে সিন্দুকের ভিতরে একবার খুলে দেখা যায় না? কৌতূহল চেপে রাখা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীর কথাও তাঁর মনে পড়ল—নির্বিঘ্নে বাড়িতে পৌঁছবার আগে তিনি যেন সিন্দুকের ভিতর থেকে ঝাঁপিটা বের না করেন। অগত্যা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি সিন্দুকের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন, যেন তাঁর চোখের দৃষ্টি দিয়েই সিন্দুকের লোহার পাতকে তিনি ভেদ করে ফেলবেন।

হঠাৎ একটা কথা তাঁর মনে জাগল, ভাবতে ভাবতে তিনি উঠে বসলেন—'আচ্ছা, ভালো কথা, প্রহরী ত আমাকে ঝাঁপিটা দেখতে নিষেধ করে নি। শুধু সিন্দুকের ভিতর থেকে বের করে আনতে বারণ করেছে। তবে সিন্দুকটা খুলে এক পলকের মত একবার চোখ বুলিয়ে নিতে দোষ কি? তাতেও একটু মনের শান্তি পাওয়া যেতে পারে।' তিনি তাঁর থলিয়ার ভিতর থেকে সিন্দুক খোলার পঞ্চাশটা চাবি বের করলেন। পঞ্চাশটা কুলুপে পঞ্চাশটা চাবি লাগিয়ে ঘোরালেন। তারপর খুলল সিন্দুক। আবদুল্লা সিন্দুকের ডালা আস্তে আস্তে উঠিয়ে ফেললেন। ভিতরে ছিল একটি ছোট্ট সোনার ঝাঁপি, একরাশ রেশমের সুতো দিয়ে জড়ানো। সুতোগুলো একেবারে আনকোরা রেশমের, গুটি পোকার গায়ের গন্ধ যেন তখনো লেগে রয়েছে।

'বাঃ, কি চমৎকার দেখতে!' আবদুল্লা বলে উঠলেন। ঝাঁপিটি বাস্তবিকই দেখতে খুব সুন্দর, গোলাপফুলের আদলে তৈরি। তার পাপড়িগুলো খাঁটি সোনার, মিহি কারুকার্য ফুটিয়ে তোলা তাতে। পাপড়িগুলো মুদে এসে বন্ধ হয় ঝাঁপির ঠিক মাঝখানে, তাইতে সব মিলিয়ে একটা খাঁটি সোনার বাক্সের মত দেখায়।

ঝাঁপির সৌন্দর্য দেখে আবদুল্লা তন্ময় হয়ে গেলেন, দুনিয়ার সব কিছু ভুলে গেলেন। তার সোনার পাপড়িতে ফুটিয়ে তোলা শিল্পকাজের শোভা কাছে এনে ভালো করে দেখবার জন্য তিনি রেশমের সুতোর নরম বিছানা থেকে ঝাঁপিটাকে তুলে আনলেন। কিন্তু যেমনি সিন্দুকের বাইরে ঝাঁপি এনেছেন অমনি একটা প্রচণ্ড শব্দ শোনা গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী উপরের

দিকে উঠতে লাগল। আবদুল্লা দেখলেন, সেই ধোঁয়ার ভিতরে ছোট্ট ধবধবে একটি দেবমূর্তি সোনার গোলাপফুলের আসনে বসে আছেন। সেই মূর্তি ক্রমশঃ উপরে উঠতে উঠতে শেষটা একেবারে মেঘের মধ্যে মিলিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তিনিই ছিলেন সন্তোষের দেবী। তিনি চিরকালের জন্য অন্তর্ধান করে গেলেন।

আবদুল্লা একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। কথামত কাজ তিনি করেন নি, তাই এত কষ্ট স্বীকার করে যে অমূল্য জিনিস তিনি পেয়েছিলেন, এক পলকের মধ্যে তা হাতছাড়া হয়ে গেল, তার ফল তিনি হাতে হাতে পেলেন। মনের দুঃখ মনে নিয়েই তিনি বাড়ি ফিরলেন। বাড়ি থেকে বেরোবার সময়ে তাঁর যা ধনদৌলত ছিল, তার বেশির ভাগই হারিয়ে আজ তিনি গরিব। তাঁর মনের অসন্তোষ বেড়ে গেল চারগুণ!

সন্তোষের দেবী আর কোনদিন তাঁর মেঘপুরীর বাড়ি থেকে নেমে এলেন না। পারস্যের লোকেরা তাই বলে যে এই জন্যেই লোকের মনে সন্তোষ নেই। যার যা আছে, তাতে তার মন ওঠে না! যা নেই তাই পাওয়ার জন্যে সকলেই মনে মনে ছটফট করে।

আকাশের বুকে চল্ উড়ে

বারীন বসু

খোকা বলে 'তোতা পাখি এত করে কাছে ডাকি
তবু কেন দিস্ নে রে সাড়া?
আকাশের কোল জুড়ে কোথা যাস উড়ে উড়ে
সারাদিনই থাকে বুঝি তাড়া?
তোতা পাখি বলে হেসে 'যাই যে মেঘের দেশে,
তারাদের সাথে করি খেলা,
নয় তো কখনো ভাই চাঁদের মহলে যাই
সেইখানে গল্পের মেলা।'
খোকামণি বলে, 'পাখি, আহ্লাদে মাখামাখি
ভোর থেকে বিকেল যে তোর,
দেখ্ কি আমার জ্বালা, পড়াশুনো, পাঠশালা,
এতটুকু ছুটি বড়জোর!'
পাখি বলে, 'বই ফ্যাল্, তার চেয়ে পাখা ম্যাল্,
আকাশের বুকে চল্ উড়ে;
ডানা তোর নাই থাক ভাবনার বোঝা রাখ্
আমি দুটো দেব ঠিক জুড়ে।'
খোকা বলে, 'না, না, ভাই, করে দেবে শেষে ছাই
গন্‌গনে সূর্যের আলো;
পড়নিকি ইস্কুলে নাকি সবই গেছ ভুলে
অতি লোভ মোটে নয় ভালো?
এখানে রয়েছে পড়া রয়েছে শাসন কড়া
রয়েছে বেয়াড়া পাঠশালা;
তবুও মায়ের বুকে রাতে যেই পড়ি ঢুকে
নিমেষে জুড়োয় সব জ্বালা!'

একশৃঙ্গ অভিযান

সত্যজিৎ রায়

প্রোফেসর শঙ্কুর
ধারাবাহিক এ্যাডভেঞ্চার
উপন্যাস

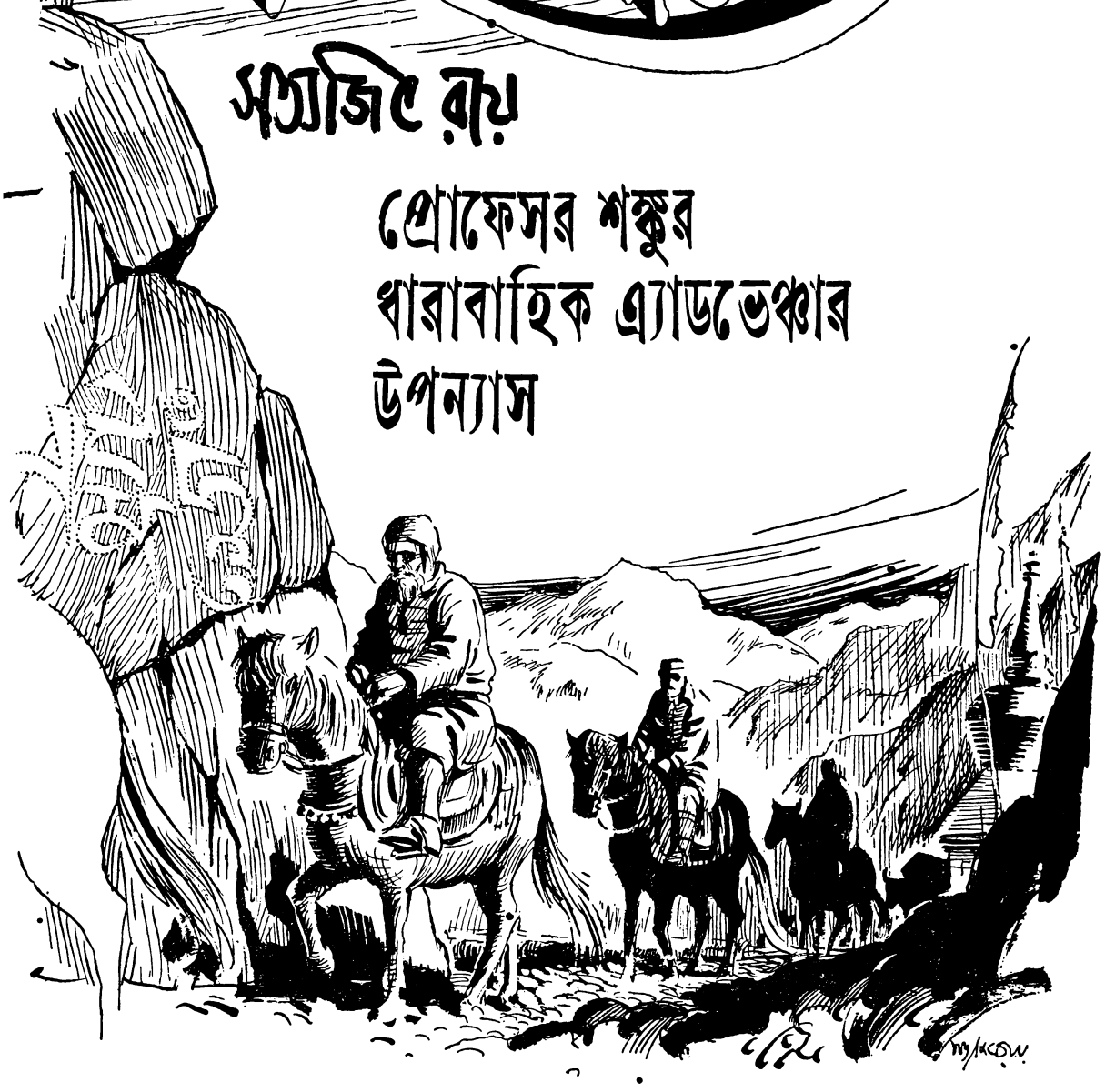

(তিব্বত পর্যটক চার্লস উইলার্ডের খামপা দস্যুদের হাতে মৃত্যু হলে, তাঁর আশ্চর্য ডায়রিতে একশৃঙ্গ ইউনিকর্ণ আর উড়ন্ত লামার বিবরণ পড়ে ভূতত্ত্ববিদ জেরেমি সণ্ডার্সের সঙ্গে তিব্বত অভিযানে এসেছেন প্রোফেসর শঙ্কু আর তাঁর পড়শী অবিনাশবাবু, সঙ্গে জর্মন পণ্ডিত উইল্‌হেলম্ ক্রোল ও রুশ সের্গেই মার্কোভিচ। চাংথাং ছাড়িয়ে এক গুম্ফার মৌনী লামা ইঙ্গিতে জানালেন যে ইউনিকর্ণ আছে কিন্তু দেখা যাবে না আর উড়ন্ত লামা ছিলেন কিন্তু নেই।

মার্কোভিচের কোকেনের গুপ্ত ভাণ্ডার আবিষ্কার করে, ফেলে দিয়ে, তাকে নেশামুক্ত করা হল। পরে আবিষ্কৃত হল যে সে নানা গুম্ফা থেকে সোনার মূর্তি এবং গিয়ানিমার হাট থেকে কস্তুরী চুরি করে নিয়ে চলেছে! সম্ভবতঃ সে দাগী চোর মার্কহ্যাম—মার্কোভিচ তার ছদ্মনাম।

চাংথাং অঞ্চলের চেহারা অতি ভয়াবহ। খালি বালি পাথর আর বরফ। আরো সামনে দেখা যায় প্রাচীরের মত, সেটা নাকি 'ডুংলুং-ডো', যা পেরিয়ে মানুষ যেতে পারে না।)

৪

১৯শে আগস্ট।

এক আশ্চর্য গুম্ফায় এক লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা। এটাই যে উইলার্ডের থোকচুম-গুম্ফা তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ গুম্ফায় পৌঁছানর তিন মিনিট আগেই রাস্তার ধারে একটা পাথরের গায়ে সেই বিখ্যাত তিব্বতী মহামন্ত্রের নীচে তিনটে ইংরাজি অক্ষর খোদাই করা দেখলাম। সি, আর, ডাব্লু—অর্থাৎ চার্লস রক্সটন উইলার্ড। আগেই বলে রাখি আমাদের কুলির মধ্যে রাবসাং ও টুণ্ডুপ ছাড়া আর সকলেই পালিয়েছে। রাবসাং পালাবে না বলেই আমার বিশ্বাস। সে যে শুধু বিশ্বাসী তা নয়; তার মধ্যে কুসংস্কারের লেশমাত্র নেই। তিব্বতীদের মধ্যে সে একটা আশ্চর্য ব্যতিক্রম। অন্যেরা যাবার সময় আমাদের সব কটা ঘোড়া এবং চারটে চমরী নিয়ে গেছে। বাকি আছে দুটো মাত্র চমরী। আমাদের তাঁবু এবং আরো কিছু ভারি জিনিস এই দুটোর পিঠে চলে যাবে। বাকি জিনিস আমাদের নিজেদের বইতে হবে। আর ঘোড়া যখন নেই, তখন বাকি পথটা হেঁটেই যেতে হবে। সেই খাড়া উঠে যাওয়া উপত্যকার অংশটা ক্রমে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, আর সেই কারণেই আমাদের দলের সকলের মধ্যেই একটা চাঞ্চল্যের ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমাদের সকলেরই বিশ্বাস ওটাই ডুংলুং-ডো, যদিও ডুংলুং-ডো যে কী তা এখনো কেউই জানিনা। সণ্ডার্সের মতে ওটা একটা কেল্লার প্রাচীর। আমার ধারণা ওটার পিছনে একটা হ্রদ আছে, যার কোনো উল্লেখ পৃথিবীর কোনো মানচিত্রে নেই।

যে গুম্ফাটার কথা লিখতে যাচ্ছি সেটার অস্তিত্ব প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বোঝা যায় নি। তার কারণ সেটা একটা বেশ উঁচু গ্র্যানিটের টিলার পিছনে লুকোন ছিল। টিলাটা পেরোতেই গুম্ফাটা দেখা গেল, আর দেখামাত্র আমাদের সকলের মুখ দিয়েই নানারকম বিস্ময়সূচক শব্দ বেরিয়ে পড়ল। সূর্য মেঘের আড়ালে থাকা সত্ত্বেও গুম্ফার জৌলুস দেখে মনে হয় তার আপাদমস্তক সোনা দিয়ে মোড়া।

কাছে গিয়ে কেমন যেন ধারণা হল যে গুম্ফায় লোকজন বেশি নেই। একটা অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা সেটাকে ঘিরে রেখেছে। আমরা পাহাড়ে পথ দিয়ে উঠে গুম্ফার ভিতরে ঢুকলাম। চৌকাঠ পেরোতেই মাথার উপর প্রকাণ্ড ব্রঞ্জের ঘণ্টা। ক্রোল তার দড়ি ধরে টান দিতেই গুরুগম্ভীর স্বরে সেটা বেজে উঠল, এবং প্রায় তিন মিনিট ধরে সেই ঘণ্টার রেশ গুম্ফার ভিতর ধ্বনিত হতে লাগল।

ভিতরে ঢুকেই বুঝতে পারলাম যে সেখানে অনেকদিন কোনো মানুষের পা পড়েনি। কেবল মানুষ ছাড়া একটা গুম্ফায় যা থাকে তার সবই এখানে রয়েছে। সণ্ডার্স দুএকবার 'হ্যালো হ্যালো' করেও কোনো উত্তর না পাওয়াতে আমরা নিজেরাই একটু ঘুরে দেখব বলে স্থির করলাম। ক্রোলের হাবভাবে বুঝলাম সে মার্কোভিচকে একা ছাড়বে না। সোনার প্রতি যার এমন লোভ, তাকে এখানে একা ছাড়া যায় না। সণ্ডার্স হল-ঘরের বাঁ দিকের দরজার দিকে এগিয়ে গেল, আমি আর অবিনাশবাবু গেলাম ডান দিকে। গুম্ফার মেঝেতে ধুলো জমেছে, ইঁদুর বসবাসের চিহ্ন চারিদিকে ছড়ানো। আমরা দুজনে সবেমাত্র ডানদিকের ঘরে ঢুকেছি, এমন সময় একটা বিকট চীৎকারে আমাদের রক্ত জল হয়ে গেল।

সণ্ডার্সের গলা। দৌড়ে গেলাম অনুসন্ধান করতে। ক্রোল, মার্কোভিচ আর আমরা দুজন প্রায় একই সঙ্গে পৌঁছলাম বাঁ দিকের একটা মাঝারি আয়তনের ঘরে। সণ্ডার্স পুব দিকের দরজার পাশে শরীরটা কুঁকড়ে ফ্যাকাশে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে, তার দৃষ্টি ঘরের পিছন দিকে।

এবার বুঝতে পারলাম তার আতঙ্কের কারণ।

একটি অতিবৃদ্ধ শীর্ণকায় মুণ্ডিতমস্তক লামা ঘরের পিছন দিকটায় বসে আছেন পদ্মাসনের ভঙ্গিতে। তাঁর শরীর সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, তাঁর হাত দুটো উপুড় করে রাখা রয়েছে একটা কাঠের ডেস্কের উপর খোলা একটা জীর্ণ পুঁথির পাতায়। লামার দেহ নিস্পন্দ, তাঁর চামড়ার যেটুকু অংশ দেখা যাচ্ছে তার রঙ ছেয়ে নীল, আর সে চামড়ার নিচে মাংসের লেশমাত্র নেই।

লামা মৃত। কবে কীভাবে মরেছেন সেটা জানার কোনো উপায় নেই, আর কী ভাবে যে তাঁর দেহ মৃত্যু-জনিত বিকারের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে সেটাও বোঝার কোনো উপায় নেই।

সণ্ডার্স এতক্ষণে খানিকটা সামলে নিয়েছে। কিছুদিন থেকেই তার স্নায়ু দুর্বল হয়েছে, তাই সে এতটা ভয় পেয়েছে। আমি জানি আমাদের অভিযান সার্থক হলে সে নিঃসন্দেহে তার স্বাস্থ্য ফিরে পাবে।

এবারে আমার দৃষ্টি গেল ঘরের অন্যান্য জিনিসের দিকে। একদিকের দেয়ালের সামনে পিতল ও তামার নানারকম পাত্র। হঠাৎ দেখলে মনে হবে বুঝি রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছি। এগিয়ে গিয়ে দেখি পাত্রগুলোর মধ্যে নানা রঙের পাউডার, তরল ও চিটচিটে পদার্থ রয়েছে। সেগুলো চেনা খুব মুশকিল। অন্যদিকের দেয়ালে সারি সারি তাকে রাখা রয়েছে অজস্র পুঁথি, আর তার নিচে মেঝেতে রয়েছে আশ্চর্য সুন্দর কাজ করা পাথর বসানো আট জোড়া তিব্বতী পশমের বুট জুতো। এছাড়া ঘরের সর্বত্র ছড়ানো রয়েছে নানারকম হাড়, মাথার খুলি, জানোয়ারের লোম ইত্যাদি। ক্রোল বলে উঠল, 'এই প্রথম একটা গুম্ফায় এসে তিব্বতী ম্যাজিকের গন্ধ পাচ্ছি।'

আমার ভয় ডর বলে কিছু নেই, তাই আমি এগিয়ে গেলাম লামার মৃতদেহের দিকে। তিনি কোন্ বিষয় অধ্যয়ন করতে করতে দেহরক্ষা করেছেন সেটা জানা দরকার। আগেই লক্ষ্য করেছি যে পুঁথির অক্ষরগুলো দেবনাগরী, তিব্বতী নয়।

পুঁথিটা ধরে টান দিতে সেটা মৃত লামার হাতের তল থেকে বেরিয়ে চলে এল আমার হাতে। লামার হাত দুটো সেই একই ভাবে রয়ে গেল চৌকির দু-ইঞ্চি উপরে।

পুঁথির পাতা উলটে পালটে বুঝতে পারলাম তার বিষয়টা বৈজ্ঞানিক। ক্রোল জিগ্যেস করাতে বললাম সেটা চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পর্কে. যদিও জানি আসলে তা নয়। যাই হোক্, আর সময় নষ্ট না করে সেটাকে সঙ্গে নিয়ে মৃত লামাকে সেই বসা অবস্থাতেই রেখে আমরা গুম্ফার অন্ধকার থেকে দিনের আলোয় বেরিয়ে এলাম।

এখন দুপুর দুটো। আমি গুম্ফার সামনেই একটা পাথরের উপর বসে আছি। পুঁথির অনেকখানি পড়া হয়ে গেছে। তিব্বতে যে ধর্মের বাইরেও কোনো কিছুর চর্চা হয়েছে, এই পুঁথিই তার প্রমাণ। অবিশ্যি এই বিশেষ লামাটি ছাড়া এই বিশেষ বিষয়টি নিয়ে কেউ চর্চা করেছে কিনা সন্দেহ। এতে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। পুঁথির নাম উড্ডয়নসূত্রম্। নিছক রাসায়নিক উপায়ে মানুষ কী ভাবে আকাশে উড়তে পারে তারই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এতে। এই উড্ডয়নসূত্রমের কথা আমি শুনেছি। বৌদ্ধ যুগে তক্ষশীলায় একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর নাম ছিল বিদ্যুদ্ধমণী। তিনিই এই বৈজ্ঞানিক সূত্র রচনা করেন, এবং করার কিছু পরেই তিব্বত চলে যান। আর তিনি ভারতবর্ষে ফেরেননি। তাঁর বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ভারতবর্ষে কেউ কোনোদিন কিছু জানতে পারেনি।

পুঁথি পড়ে এক আশ্চর্য পদার্থের কথা জানা যাচ্ছে, যার নাম ংমুং। এই ংমুং এর সাহায্যে মানুষের ওজন এত কমিয়ে দেওয়া যায় যে একটা দমকা বাতাস এলে সে-মানুষ রাজহংসের দেহচ্যুত পালকের মতো শূন্যে ভেসে বেড়াতে পারে। এই ংমুং যে কী ভাবে তৈরি করতে হয় সেটা পুঁথিতে লেখা আছে, কিন্তু তার জন্যে যে সব প্রয়োজনীয় উপাদানের কথা বলা হয়েছে তার একটারও নাম আমি কখনো শুনিনি। বল্মীক, ষলক্রু, ত্রিগন্ধা, অভ্রনীল, থূমা, জড়া—এর কোনোটাই আমার জানা নয়। যাঁর হাতের তলা থেকে পুঁথিটা নিয়ে এলাম তিনি নিশ্চয়ই জানতেন, এবং এই সব উপাদানের সাহায্যে তিনি নিশ্চয়ই ংমুং তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে ইনিই সেই 'টু হাণ্ড্রেড ইয়ার ওল্ড লামা'—যাঁর সঙ্গে উইলার্ড ওই ংমুং-এর সাহায্যেই আকাশে উড়েছিলেন। ইনি যে গত এক বছরের মধ্যে পরলোকগমন করবেন সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য; না হলে আমাদের পক্ষেও নিশ্চয়ই উইলার্ডের মতো আকাশে ওড়া সম্ভব হত।

সকলে রওনা হবার জন্য তৈরি। লেখা বন্ধ করি।

২০শে আগস্ট। ল্যা ৩৩৽৩ ন, ৮৪ লং ই।

উইলার্ডের ডায়রিতে এই জায়গাতেই ক্যাম্প ফেলার উল্লেখ আছে। আমরাও তাই করেছি। আমরা বলতে, যা ছিল তার চেয়ে দু জন কম, কারণ মার্কোভিচ ওরফে মার্কহ্যাম উধাও, আর সে-ই নিশ্চয়ই সঙ্গে করে টুণ্ডুপকে নিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, আমাদের দুটি চমরীর একটিও গেছে। আমি কদিন থেকেই মার্কোভিচকে মাঝে মাঝে টুণ্ডুপের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি। তখন অতটা গা করিনি। এখন বুঝতে পারছি ভিতরে ভিতরে একটা ষড়যন্ত্র চলছিল।

ঘটনাটা ঘটে কাল বিকেলে। গুম্ফা থেকে রওনা হবার ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই আমাদের একটা প্রলয়ঙ্কর ঝড়ে পড়তে হয়েছিল। যাকে বলে ব্লাইণ্ডিং স্টর্ম। সাময়িক ভাবে সত্যিই আমরা একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ছিলাম। কে কোথায় রয়েছে, কোনদিকে যাচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। প্রায় আধঘণ্টা পরে ঝড় কমলে পর দেখি দুটি মানুষ আর একটি চমরী কম। তার উপরে যখন দেখলাম যে একটি বন্দুকও কম, তখন বুঝতে বাকি রইল না যে ব্যাপারটা অ্যাক্সিডেণ্ট নয়। মার্কোভিচ প্ল্যান করেই পালিয়েছে, এবং তার ফেরার কোনো মতলব নেই। একদিক দিয়ে বলা যেতে পারে আপদ বিদেয় হল, কিন্তু সেই সঙ্গে আবার আপশোষ হল যে তার শয়তানির উপযুক্ত শাস্তি হল না। ক্রোল ত চুল ছিঁড়তে বাকি রেখেছে। বলছে এসব লোকের সঙ্গে ভালোমানুষী করার ফল হচ্ছে এই। যাই হোক্, যে চলে গেছে তার কথা ভেবে আর লাভ নেই। আমরা তাকে ছাড়াই ডুঙ্গুং-ডোর উদ্দেশে পাড়ি দেবো।

উত্তরে চাইলেই এখন ডুংলুং-ডোর প্রাচীর দেখতে পাচ্ছি। এখনো মাইল পাঁচেক দূর। তা সত্ত্বেও প্রাচীরের বিশালত্ব সহজেই অনুমান করা যায়। পূব-পশ্চিম অন্তত মাইল কুড়ি-পঁচিশ লম্বা বলে মনে হয়। উত্তর-দক্ষিণের দৈর্ঘ্য বোঝার কোনো উপায় নেই। বোধ হয় ডুংলুং-ডোর দিক থেকেই একটা গন্ধ মাঝে মাঝে হাওয়ায় ভেসে আসছে, সেটাকে প্রথমে কস্তুরী বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু এখন অন্যরকম লাগছে। সেটা কিসের গন্ধ বলা শক্ত, শুধু এটুকু বলতে পারি যে এমন খোস্‌বু আমাদের কারুর নাকে এর আগে কখনো প্রবেশ করেনি।

আবার ঝোড়ো বাতাস আরম্ভ হল। এবার তাঁবুতে গিয়ে ঢুকি।

২০শে আগস্ট দুপুর দেড়টা।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, চারিদিক ঘোলাটে অন্ধকার, তার মধ্যে লক্ষ বাঁশির মতো শব্দ করে ব্লিজার্ড বা বরফের ঝড় বইছে। ভাগ্যিস গিয়ানিয়ার বাজার থেকে বিলিতি তাঁবুর বদলে তিব্বতী পশমের তাঁবু কিনে নিয়েছিলাম।

আজ সারাটা দিন এই ক্যাম্পেই থাকতে হবে বলে মনে হচ্ছে।

২০শে আগস্ট, বিকেল পাঁচটা।

আমাদের তিব্বত অভিযানের একটা হাইলাইট বা বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা এই কিছুক্ষণ আগে ঘটে গেল।

তিনটে নাগাৎ ঝড়টা একটু কমলে পর রাবসাং আমাদের চারজনকে মাখন-চা দিয়ে গেল। বাইরে ঝড়ের শব্দ কমলেও দম্‌কা বাতাসে আমাদের তাঁবুর কাপড় বার বার কেঁপে উঠছিল। অবিনাশবাবু তাঁর চায়ে চুমুক দিয়ে 'ভেরি গুড' কথাটা সবে উচ্চারণ করেছেন এমন সময় বাইরে, যেন বহুদূর থেকে, একটা চীৎকার শোনা গেল। পুরুষকণ্ঠে পরিত্রাহি চীৎকার। কথা বোঝার উপায় নেই, শুধু আর্তনাদের সুরটা বোঝা যাচ্ছে। আমরা চারজনে চায়ের পাত্র রেখে ব্যস্তভাবে তাঁবুর বাইরে এলাম।

'হেল্‌প, হেল্‌প···সেভ মি! হেল্‌প!···'

এবার বোঝা যাচ্ছে। কণ্ঠস্বরও চেনা যাচ্ছে। অ্যাদ্দিন মার্কোভিচ ইংরিজি বলেছে রাশিয়ান উচ্চারণে। এই প্রথম তার মুখে খাঁটি ইংরেজের উচ্চারণ শুনলাম। কিন্তু লোকটা কোথায়? রাবসাংও হতভম্বের মতো এদিকে ওদিকে চাইছে, কারণ চীৎকারটা একবার মনে হচ্ছে দক্ষিণ থেকে, একবার মনে হচ্ছে উত্তর থেকে আসছে।

হঠাৎ ক্রোল চেঁচিয়ে উঠল—'ওই ত!'

সে চেয়ে আছে উত্তরে নয়, দক্ষিণে নয়—একেবারে শূন্যে, আকাশের দিকে। মাথা তুলে স্তম্ভিত হয়ে দেখি মার্কোভিচ শূন্যে ভাসতে ভাসতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। একবার সে নিচের দিকে নামে, পরক্ষণেই এক দম্‌কা বাতাস তাকে আবার উপরে তুলে দেয়। এই অবস্থাতেই সে ক্রমাগত হাত পা ছুঁড়ে চীৎকার করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে।

কী ভাবে সে এই অবস্থায় পৌঁছাল সেটা ভাববার সময় নেই; কী করে তাকে নামান যায় সেটাই সমস্যা। কারণ পাগলা হাওয়া যে শুধু থামছেই না তা নয়, ক্ষণে ক্ষণে তার বেগ ও গতিপথ বদলাচ্ছে।

'লেট্ হিম স্টে দেয়ার!' সণ্ডার্স হঠাৎ বলে উঠল। ক্রোল সে কথায় তৎক্ষণাৎ সায় দিল। তারা বুঝেছে মার্কোভিচকে শাস্তি দেবার এটা চমৎকার পন্থা। এদিকে আমার বৈজ্ঞানিক মন বলছে মার্কোভিচ নিচে না নামলে তার ওড়ার কারণটা জানা যাবে না। রাবসাং কিন্তু ইতিমধ্যে তার তিব্বতী বুদ্ধি খাটিয়ে কাজে লেগে গেছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সে খান দশেক লম্বা চমরীর লোমের দড়ি পরস্পরের সঙ্গে গেরো বেঁধে তার এক

াথায় একটা পাথর বেঁধে সেটাকে
ার্কোভিচের দিকে তাগ করে
ছাড়ার জন্য তৈরি হল।

ক্রোল তাকে গিয়ে বাধা
দল। মার্কোভিচ এখন
আমাদের মাথার উপর এসে
পড়েছে। ক্রোল তার দিকে
ফিরে কর্কশ গলায় চীৎকার
করে বলল, 'ড্রপ দ্যাট গান
ফাস্ট'। অর্থাৎ, আগে
তোমার হাত থেকে
বন্দুকটা নিচে ফেল।
মার্কোভিচের হাতে
বন্দুক রয়েছে
সেটা এতক্ষণ
দেখিনি।

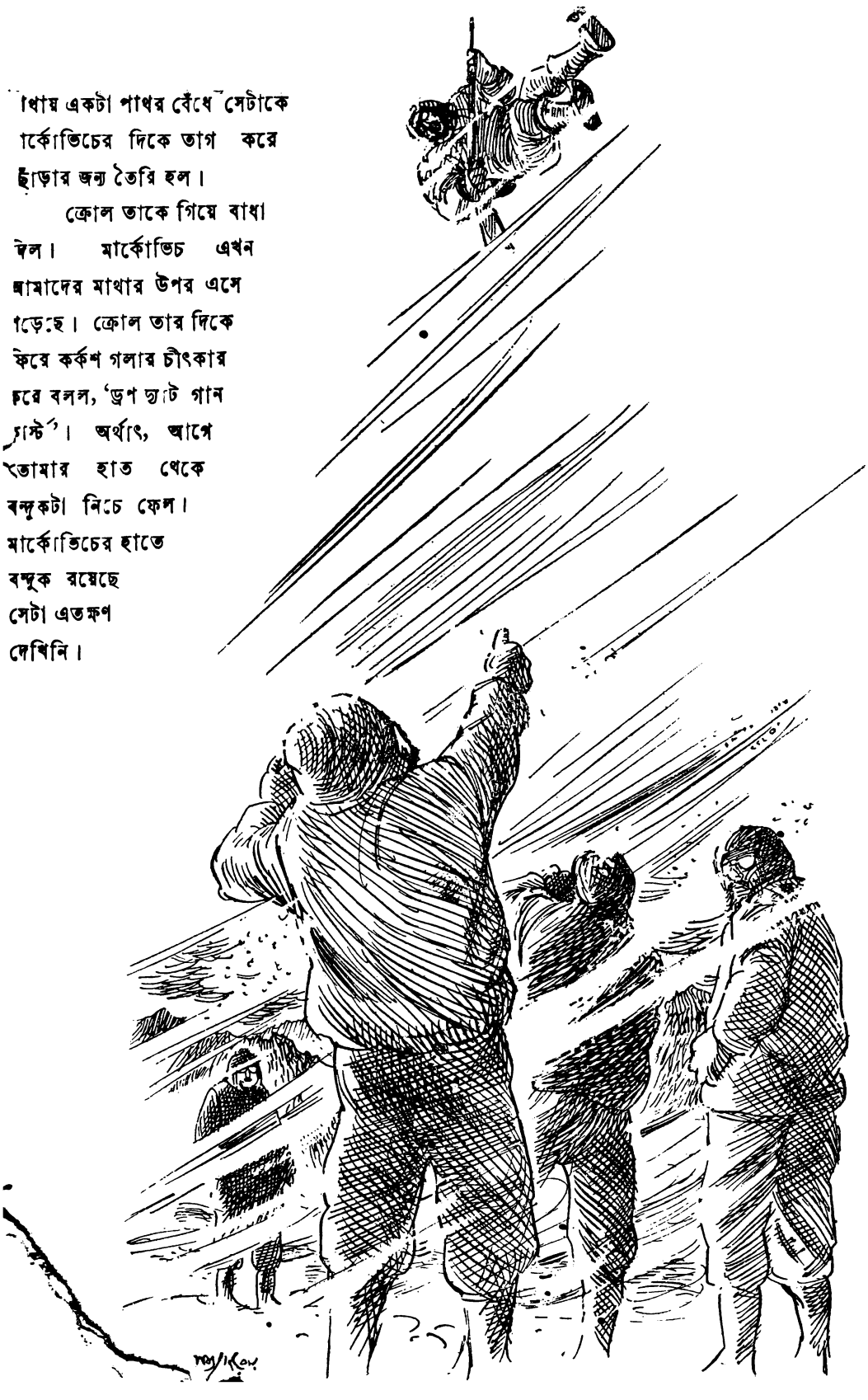

মার্কোভিচ বাধ্য ছেলের মতো তার হাতের মানুলিখারটা ছেড়ে দিল, আর সেটা আমাদের থেকে দশ হাত দূরে মাটিতে পড়ে খানিকটা আলুগা বরফ চারদিকে ছিটিয়ে দিল।

এবার রাবসাং দড়ির মাথায় বাঁধা পাথরটা মার্কোভিচের দিকে ছুঁড়ে দিল। অব্যর্থ লক্ষ্য। মার্কোভিচ খপ্ করে সেটা লুফে নিল। তারপর রাবসাং একাই অনায়াসে তাকে টেনে মাটিতে নামিয়ে আনল।

এইবার লক্ষ্য করলাম যে মৃত লামার ঘরে যে বাহারের বুট জুতো দেখেছিলাম, তারই একজোড়া রয়েছে মার্কোভিচের পায়ে। এছাড়া তার কাঁধের ঝোলার ভিতর থেকেও গুম্ফার অনেক জিনিস বেরোল, তার অধিকাংশই সোনার। ডাকাত হাতে হাতে ধরা পড়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে এমনই একটা আশ্চর্য জিনিসের সন্ধান সে আমাদের দিয়েছে, যে তাকে শাস্তি বা ধমক দেওয়ার কথাটা আমাদের মনেই হল না।

মার্কোভিচ আমাদের ছেড়ে পালিয়েছিল ঠিকই, আর তার মতলব ছিল যাবার পথে মৃত লামার গুম্ফা থেকে বেশ কিছু মূল্যবান দ্রব্য সরিয়ে নেওয়া। মূর্তি-টুর্তি ঝোলায় ভরার পর তার বুটের কথাটা মনে পড়ে। সেদিন থেকেই তার লোভ লেগেছিল ওই জিনিসটার ওপর। বুট নিয়ে বাইরে এসে সেটা প'রে দু এক পা হেঁটেই বুঝতে পারে নিজেকে বেশ হাল্কা লাগছে। এইভাবে টুগুপ সমেত দুমাইল সে দিব্যি চলেছিল, এমন সময় এক উত্তরমুখী ঝড় এসে তার সমস্ত ফন্দি ভণ্ডুল করে দিয়ে তাকে আকাশে তুলে নিয়ে আবার আমাদেরই কাছে এনে হাজির করে।

ক্রোল ও সণ্ডার্স স্বভাবতই এই কাহিনী শুনে একেবারে হতভম্ব। তখন আমি তাদের পুঁথি আর ংমুং-এর কথাটা বললাম। 'কিন্তু তার সঙ্গে এই বুটের সম্পর্ক কী?' প্রশ্ন করল সণ্ডার্স। আমি বললাম, 'পুঁথিতে এই-ংমুং-এর সঙ্গে মানুষের গুল্‌ফ বা গোড়ালির একটা সম্পর্কের কথা বলা আছে। আমার বিশ্বাস এই দুইয়ের সংযোগেই মানুষের দেহের ওজন কমে যায়। আমি জানি ওই বুটের সুকতলায় ংমুং-এর প্রলেপ লাগান আছে।'

অন্য সময় হলে কী হত জানি না, চোখের সামনে মার্কোভিচকে উড়তে দেখে ক্রোল ও সণ্ডার্স দুজনকেই আমার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হল। বলা বাহুল্য, এই তিব্বতী বুট আমাদের প্রত্যেকেরই একটা করে চাই। রাবসাংকে বলতে সে বলল সে নিজেই গুম্ফা থেকে আমাদের চারজনের জন্য চার জোড়া জুতো নিয়ে আসবে।

মার্কোভিচ এখন একেবারে সুবোধ বালকটি। তার কাছে চোরাই মাল যা ছিল সব আমরা বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছি। সেগুলো ফেরার পথে সব যথাস্থানে রেখে দেওয়া হবে। মার্কোভিচ জানে যে আমাদের কাছে তার মুখোশ খুলে গেছে। এর পরে সে আর কোনো বাঁদরামি করবে বলে ত মনে হয় না। তবে 'অঙ্গারঃ শতধৌতেন…' ইত্যাদি।

২১শে আগস্ট।

আমরা ডুংলুং-ডোর প্রাচীরের সামনে ক্যাম্প ফেলে বসে আছি কাল বিকেল থেকে। খাড়াই উঠে গেছে প্রাচীর প্রায় দেড়শ ফুট! এটা যে কী দিয়ে তৈরি তা ভূতত্ত্ববিদ্ সণ্ডার্স পর্যন্ত বলতে পারল না। কোনো চেনা পাথরের সঙ্গে এই গোলাপী পাথরের কোনো মিল নেই। এ পাথর আশ্চর্য রকম মসৃণ ও আশ্চর্য রকম মজবুত। ধাপে ধাপে গর্ত করে তাতে পা ফেলে ওপরে ওঠার কোনো প্রশ্ন উঠে না। ক্রোল তিব্বতী বুট পরে দু একবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু হাওয়ার অভাবে বিশ-পঁচিশ ফুটের ওপরে পৌঁছাতে পারেনি। অথচ

প্রাচীরের পিছনে কী আছে জানবার একটা অদম্য কৌতূহল হচ্ছে। সণ্ডার্স বলছে একটা দুর্গ জাতীয় কিছু। আমি এখনো বলছি হ্রদ।

অবিনাশবাবু আরো পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য তৈরি হয়ে আছেন। প্রাচীরের পিছন থেকে কোনোরকম শব্দ না পেলেও ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল মনমাতানো গন্ধে চারিদিক মস্‌গুল হয়ে আছে। আমরা তিন তিন জন ডাক-সাইটে বৈজ্ঞানিক এই গন্ধের কোনো কারণ খুঁজে না পেয়ে বোকা ব'নে আছি।

২২শে আগস্ট্।

আশ্চর্য বুদ্ধি প্রয়োগ—অভাবনীয় তার ফল।

আমাদের সঙ্গে পুরোন খবরের কাগজ ছিল অনেক। সেইগুলোর সঙ্গে দুটো তিব্বতী ম্যাপ আর কিছু র‍্যাপিং পেপার জুড়ে, আমাদের স্টকের তার দিয়ে কাঠামো বানিয়ে, একেবারে খাঁটি দিশি উপায়ে একটা ফানুষ তৈরি করে আগুন জ্বালিয়ে তাতে গ্যাস ভরলাম। তারপর সেটার সঙ্গে একটা দুশো ফুট লম্বা দড়ি বাঁধলাম। সেই দড়িতে আমার ক্যামেরা বেঁধে, পাঁচিলের দিকে তার মুখ ঘুরিয়ে, পনের সেকেণ্ড পরে আপনি ছবি উঠবে এরকম একটা ব্যবস্থা করে ফানুষ ছেড়ে দিলাম। দড়ি-ক্যামেরা সমেত সাঁই সাঁই করে ফানুষ উপরের দিকে উঠে গেল প্রাচীরের মাথা ছাড়িয়ে যেতে লাগল ছ'সেকেণ্ড। তারপর আর দড়ি ছুঁড়লাম না। বিশ সেকেণ্ড পরে ফানুষ সমেত ক্যামেরা নামিয়ে আনলাম।

ছবি উঠেছে। রঙীন ছবি। হ্রদের ছবি নয়। দুর্গেরও ছবি নয়। গাছপালা লতাগুল্মে ভরা এক অবিশ্বাস্য সুন্দর সবুজ জগতের ছবি। এরই নাম ডুংলুং-ডো।

আপাতত আমরা প্রাচীর থেকে প্রায় বারশো গজ দূরে একটা পাথরের ঢিবির পাশে বসে আছি। আমাদের পাঁচজনেরই পায়ে তিব্বতী বুট। আমরা অপেক্ষা করছি ঝড়ের জন্য। আশা আছে সেই ঝড় আমাদের উড়িয়ে নিয়ে ডুংলুং-ডোর প্রাচীরের ওপারের রাজ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলবে। তারপর কী আছে কপালে তা জানি না।

(ক্রমশঃ)

লিমেরিক

উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

কোথায় লাগে ছিঁচকাঁদুনী বুথ সাহেবের কন্যা
তাকেও যেন টেক্কা দেবেন শ্রীমতী অনন্যা!
এমন তিনি সৃষ্টি ছাড়া
অষ্ট প্রহর কাঁপান পাড়া
এক নাগাড়ে একুশ ঘণ্টা একটুও ঘুমোন না!

ছোট্ট কালো সোনার ছেলে

সায়নদেব মুখোপাধ্যায়

পাহাড় কোলে ছোট্ট একটি গ্রামের যে ধার
সপ্তপর্ণী গাছের মাঝে ছোট্ট কুটির—
ছোট্ট কালো সোনার ছেলের মনের সেতার—
উঠল বেজে পেয়ে খবর পুজোর ছুটীর।
বাবা গেছেন বন পেরিয়ে অভ্রখনি,
মা গিয়েছেন ফুল ভাসাতে নদীর ঘাটে,
চুপটি বসে দুইজনেরই চোখের মণি—
মন চলেছে বাবার সাথে গাঁয়ের হাটে।
ছোট্ট কালো সোনার ছেলে একলা বসে—,
উড়ছে ধুলো, উড়ছে বালি শুকনো পাতা,
দূর পাহাড়ের মাঠের ধারে লাঙল চষে—
ফিরছে চাষী। ঘুরছে কোথায় গমের যাঁতা।
সূয্যি তখন অনেক দূরে পাহাড় পারে—
গাছের আগায় দিচ্ছে সোনার ঝিলিক ঢেলে,
ছোট্ট ছেলের মনের ভিতর সারে সারে—
ফুটছে ছবি। উড়ছে আকাশ পাখনা মেলে।
ভাবছে বসে ছোট্ট কালো সোনার ছেলে—
বাবা যে তার হাটের পথে ফিরবে কখন—
মা তো ফিরে দাওয়ায় দেবেন পিদিম জ্বেলে—
সন্ধ্যাতারা আকাশ কোলে ফুটবে যখন।
মা ফিরেছেন, বেড়ার ধারে শব্দ হ'ল—
ছোট্ট ছেলে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে;
হঠাৎ আকাশ বাতাস কিসে চমকে দিল—
দত্যিদানা লাফিয়ে এল বিষম ঝড়ে—!
তাকিয়ে দেখে দুইজনাতে দূর আকাশে—
ঝকঝকে এক বিচিত্র যান ডানা মেলা—
তীরের মতো যাচ্ছে উড়ে, মেঘের পাশে
আকাশ বাতাস চন্দ্র সূর্য করছে হেলা।
অবাক মনে ছেলে তাকায় আকাশ পানে—,
বিস্ময়ে তার চোখের পাতা পড়ছে না আর।
হঠাৎ দেখে দূরে পথের ঐ ওখানে,
আসেন হেঁটে, বনের পথে, বাবা যে তার।
ছুট্টে গিয়ে ছেলে ওঠে বাবার কাঁধে,
বলে, 'বাবা, ওইটা কি গো দূর আকাশে?
বুঝছি নাকো কিছুই। ও কি যাচ্ছে চাঁদে?'
মা-ও তখন দাঁড়ান এসে বাবার পাশে।
বলেন বাবা, 'উড়োজাহাজ চলছে উড়ে,
বিজ্ঞানীদের তৈরি করা কলের গাড়ি,
মানুষ আছে, চালক আছে ওর ভিতরে,
যাচ্ছে উড়ে, দূর দেশেতে দিচ্ছে পাড়ি।'
ছোট্ট সোনার ছেলে তাকায় আকাশ কোণে—
দেখতে না পায় কলের গাড়ি। দূরের থেকে
ভেসে আসে আওয়াজ শুধু পাহাড়-বনে
সোনালী রোদ হলুদ মেঘে ফেলছে ঢেকে।
বাবা তখন ঝুলি খোলেন, মুখে হাসি
খোকা মায়ের হাতটি ধরে, খুসির মনে
দেখছে কেবল—কাঠের ঘোড়া, বাঁশের বাঁশী,
তালের পাতার সেপাই এবং রাজার কনে।
সন্ধে হল মা দিয়েছেন পিদিম জ্বেলে,
দাওয়ার বসে তারায় ভরা আকাশ পানে,
তাকিয়ে আছে ছোট্ট কালো সোনার ছেলে,
আকাশ পাতাল ভাবছে কি যে সেই তা জানে!
ভাবছে কেমন কলের গরুড় যাচ্ছে উড়ে
সঙ্গে নিয়ে দেশবিদেশের যাত্রী কত
কোথায় যাবে কোন দেশেতে কোন সুদূরে
বিস্ময়ে মন যাচ্ছে ভরে ভাবছে যত।

অনেক দিনের আগের কথা লিখছি এ যে—
আজকে এ সব সবাই জানে, সবার দেখা।
অবাক চোখে তাকায় না কেউ আকাশে যে—
ইস্কুলেতে পড়া এ সব, বইয়ে লেখা।
বিজ্ঞানের আর কারিগরীর যন্ত্র হাতে,
স্কুল কলেজে কলের মানুষ হচ্ছে যারা
শিক্ষা তাদের হচ্ছে যে নেই সন্দ' তাতে,
কিন্তু তবু একটা কথা বলুক তারা—
এত পড়ার শেষে ক'রে পরীক্ষা পাশ
যন্ত্র কারাগারে আটক পড়বে যদি
কখন তবে দেখবে বল রঙীন আকাশ ?
দেখবে কখন ঝর্না সাগর পাহাড় নদী ?

ছোটদের বন্ধু টমাস

অরুণ দে

একদিন রাত্রে খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল। টমাস দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে চুপ করে বসেছিল। হঠাৎ তার মনে হল কে যেন দরজায় কড়া নাড়ছে। সে কান পেতে শুনল—সত্যি, কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। এই শীতের রাত্রে বৃষ্টির মধ্যে আবার কে এল ?

কি ভেবে দরজা খুলল টমাস। ঝড় আর বৃষ্টি তার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। কিন্তু টমাস ঝড় বৃষ্টির কথা ভুলে গেল কারণ সে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে দেখল একটা ছোট ছেলে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তার গায়ে এক টুকরো ময়লা কাপড় জড়ানো। শীতে হি হি করে কাঁপছে। টমাস বলল, 'খোকা তুমি কি চাও ? এত রাতে এখানে এসেছ কেন ?'

ছোট ছেলেটি বলল, 'আমাকে দয়া করে আজ রাতটুকুর জন্য আশ্রয় দিন। আমার মা-বাবা কেউ নেই, কোথাও থাকবার জায়গা নেই। শীতে হাত-পা জমে যাচ্ছে। আর রাস্তায় থাকতে পারছি না।'

ছেলেটাকে ঘরে এনে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিল টমাস।

কিছুক্ষণ পর ঝড়বৃষ্টি থামল। ততক্ষণে টমাস আর ছোট ছেলেটার মধ্যে বন্ধুত্ব জমে উঠেছে। টমাস ছেলেটার থেকে অনেক বড়। সে ডাক্তারি পড়ে, পয়সাকড়িও আছে। কিন্তু তার কোন অহঙ্কার নেই। ছোট ছেলেটার সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলল।

ছেলেটার মুখে টমাস শুনল এই শহরে তার মত অনেক অনাথ ছেলে আছে। তারা পেট ভরে খেতে পায় না, ছেঁড়া জামা পরে থাকে—তাদের আপনজন বলতে কেউ নেই। তারা যদি রাস্তায় শুয়ে থাকে তবে পুলিস তাদের তাড়া করে, ছিঁচকে চোর ভেবে থানায় নিয়ে আটকে রাখে।

ছেলেটার কথা শুনে টমাস খুব অবাক হল। এটা লণ্ডন শহর। এখানে কত বড় বড় বাড়ি আছে, কত গাড়ি আছে, হোটেলে রেঁস্তোরায় কত টাকাপয়সার ছড়াছড়ি—এখানে নিরাশ্রয় ছোট ছেলেরা পুলিসের ভয়ে রাত্রে লুকিয়ে থাকে, খেতে পায় না—এ সব কি বিশ্বাস করা যায় ?

টমাসের মনের ভাব বুঝতে পেরে ছেলেটা বলল, 'আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? বেশ তো—আমার সঙ্গে রাস্তায় চলুন—এখনই আমার কথা সত্যি কিনা প্রমাণ করে দেব।'

সেদিনই মধ্যরাত্রে টমাস ছেলেটার সঙ্গে রাস্তায় বেরুল। ছেলেটা তাকে বাজারের দিকে নিয়ে গেল। বাজারের পেছনে মস্ত বড় লম্বা দেয়াল। বাজারের যা কিছু আবর্জনা দেয়ালের পেছনে ফেলা হয়। ছেলেটা দেখাল সেই আবর্জনার মধ্যে এগারজন অনাথ ছেলে ঘুমোচ্ছে। তা ছাড়াও অভাগা ছেলেদের লুকিয়ে থাকার আরও অনেক জায়গা দেখাল ছেলেটা।

ছোট ছেলেদের দুরবস্থা দেখে টমাসের খুব কষ্ট লাগল।

কয়েকদিন পরে এক সন্ধ্যায় এক বিরাট সভায় টমাস সকলের সামনে তার মধ্যরাত্রির অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করল। কিন্তু কেউ তার কথা বিশ্বাস করল না। আজগুবি গল্প বলে সভার লোকদের চমকে দিচ্ছে ভেবে অনেকে টমাসকে ঠাট্টা করতে লাগল। পরদিন কাগজে একজন লিখল, 'টমাস গতকাল সভায় যে সব গল্প বলেছে—তার যাথার্থ্য সে কি প্রমাণ করতে পারে?'

সেদিন রাত্রে টমাস একদল গণ্যমান্য লোক নিয়ে রাস্তায় বেরুল। রাস্তার একধারে একটা ত্রিপলের নিচে ভাঙ্গা পুরনো জিনিসপত্র ঢাকা থাকত। সেই ত্রিপল তুলে টমাস সবাইকে দেখাল—ত্রিপলের নিচে ৭৩ জন অনাথ ছেলে হাত-পা গুটিয়ে শুয়ে আছে। এছাড়া আরও অনেক জায়গায় অনেক অনাথ ছেলেদের পাওয়া গেল।

টমাস এর পর নিজের টাকা খরচ করে অনাথ ছেলেদের জন্য একটা আশ্রম তৈরি করল। সে আশ্রমে ছেলেরা খেতে পেত, পোশাক পেত, পড়াশুনাও করতে পারত। সব খরচ দিত টমাস নিজে। সে স্থির করল তার টাকায় যত ছেলেকে আশ্রমে রাখা সম্ভব তা সে রাখবে কিন্তু কারো কাছে টাকা ধার করবে না। আশ্রমের নির্দিষ্ট সংখ্যক ছেলে ভর্তি হয়ে যাবার পর যদি কেউ আশ্রয় চাইতে আসত তবে টমাস টাকার অভাবে বাধ্য হয়ে তাকে ফিরিয়ে দিত।

একদিন রাত্রে টমাস একটা ছেলেকে ফিরিয়ে দেবার সময় বলল, 'আর জায়গা নেই। সিট খালি হলেই তোমাকে নেব। তুমি কিছুদিন অপেক্ষা কর।' ছেলেটা সেকথা শুনে শুকনো মুখে চলে গেল। কয়েকদিন পরে টমাসের চোখে পড়ল সেই ছেলেটা রাস্তায় একটা পিপের মধ্যে মরে পড়ে আছে। খেতে না পেয়ে ছেলেটা মরে গেছে।

সেই দৃশ্য দেখে টমাস কেঁদে ফেলল তারপর সে আর কাউকে কখনও তার অনাথ আশ্রম থেকে ফিরিয়ে দেয় নি। যত টাকা লাগুক সে ধার করত। নিজে দিনরাত খেটে ধারের টাকা শোধ দিত। মাত্র চল্লিশ বছর টমাস বেঁচে ছিল। সেই অল্পকালের জীবনের মধ্যে সে ষাট হাজার অনাথকে মানুষ করে তুলেছিল। পঞ্চাশটা অনাথ-আশ্রম গড়েছিল। ছোটদের এতবড় বন্ধু পৃথিবীতে খুব কমই জন্মেছেন। টমাস জন বারনারডো ১৯০৫ সালে যখন মারা গেলেন তখন হাজার হাজার ছেলে তাঁর শবযাত্রার অনুগমন করেছিল। ছোট ছেলেদের শবযাত্রার সে দৃশ্য পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়বার দেখা যায় নি।

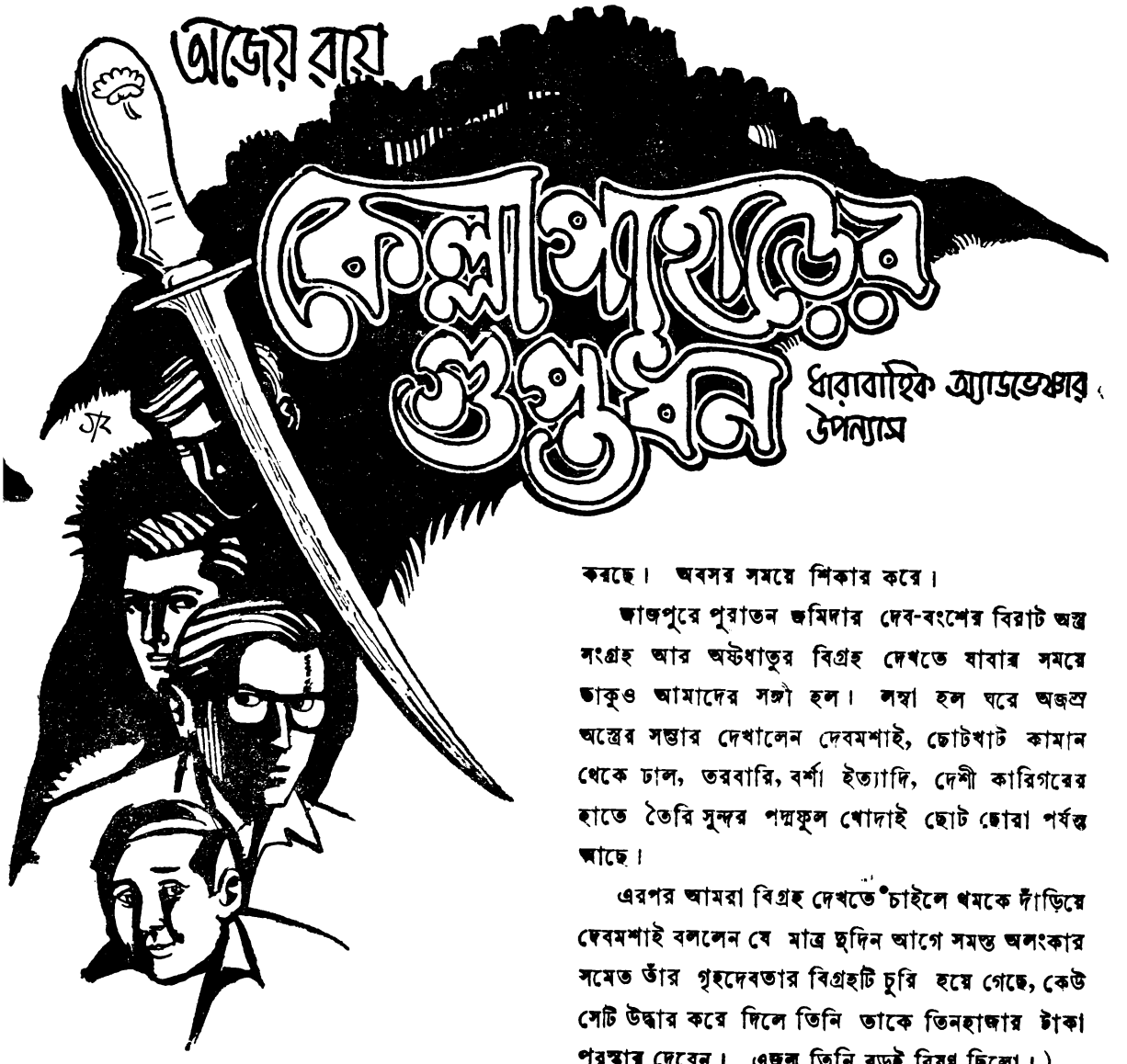

অজেয় রায়

কেল্লাপাহাড়ের গুপ্তধন

ধারাবাহিক অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস

(ছেলেবেলার বন্ধু রতনের সঙ্গে ওড়িশার কেওঞ্ঝর গড়ে তার ছোটকাকা মিঃ দত্তের বাড়ি বেড়াতে এসেছি। আমি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্র, রতন ভূতত্ত্বে। নন্দদুলাল বোস ওরফে বোসদা আমাদের সব ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন মিঃ দত্তের নির্দেশে।

জগন্নাথ মন্দির দেখতে গিয়ে হঠাৎ আমাদের স্কুলের সহপাঠী বন্ধু ডাকুর সঙ্গে দেখা। দারুণ খেলোয়াড় ও ডানপিটে ছিল, এখন বেচারি এখানে সামান্য কাজ করছে। অবসর সময়ে শিকার করে।

রাজপুরে পুরাতন জমিদার দেব-বংশের বিরাট অস্ত্র সংগ্রহ আর অষ্টধাতুর বিগ্রহ দেখতে যাবার সময়ে ডাকুও আমাদের সঙ্গী হল। লম্বা হল ঘরে অজস্র অস্ত্রের সম্ভার দেখালেন দেবমশাই, ছোটখাট কামান থেকে ঢাল, তরবারি, বর্শা ইত্যাদি, দেশী কারিগরের হাতে তৈরি সুন্দর পদ্মফুল খোদাই ছোট ছোরা পর্যন্ত আছে।

এরপর আমরা বিগ্রহ দেখতে চাইলে থমকে দাঁড়িয়ে দেবমশাই বললেন যে মাত্র দুদিন আগে সমস্ত অলংকার সমেত তাঁর গৃহদেবতার বিগ্রহটি চুরি হয়ে গেছে, কেউ সেটি উদ্ধার করে দিলে তিনি তাকে তিনহাজার টাকা পুরস্কার দেবেন। এজন্য তিনি বড়ই বিষণ্ণ ছিলো।)

॥ ২ ॥

আমরা মনে মনে লজ্জিত হলাম। সত্যি, ভদ্রলোক একবারও বুঝতে দেননি যে এত মন খারাপ। দিব্বি হাসিমুখে সব দেখালেন।

মিঃ দত্ত বললেন, 'ছি ছি, এখন আপনাকে বিরক্ত করা উচিত হয়নি। জানতাম না কিছু।'

ভদ্রলোক যদিও কথাটা উড়িয়ে দিলেম, আমরা তাঁর মনের আসল ভাবটা আন্দাজ করে তাঁকে আর বিরক্ত না করে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম।

শহরে পৌঁছে আমরা ডাকুর বাড়িতে নামলাম, কাকাবাবু গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন। খিদেটা পেয়েছিলে বেশ চন্‌চনে, তাই দোকান থেকে চা আর গরম আলুর চপ আনিয়ে জমিয়ে বসলাম।

একটা বড় বাড়ির একতলায় একটা মাঝারি সাইজের ঘর নিয়ে ডাকু থাকে। আমরা দুজন সতরঞ্চি বিছানো তক্তপোশে বসেছি, ডাকু একটা হাতল ভাঙা কাঠের চেয়ারে। গরম চপে একটা বেপরোয়া কামড় দিয়ে মুখটাকে একটু বিকৃত করে ডাকু হঠাৎ বলল, 'কোনো মানে হয় না।'

'কিসের কোনো মানে হয় না?' রতন জিজ্ঞেস করল।

'তিন হাজার টাকা। পুলিশ তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। তারা যদি বামাল সমেত চোর ধরে ফেলে তাহলে ত টাকাটা মাঠে মারা যাবে।'

আমি বললাম, 'তাই বলে তুই পুলিশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তদন্ত শুরু করবার তাল করছিস নাকি? তিন হাজার টাকা কি সকলের কপালে থাকে রে? তাও যদি বা কোনো ক্লু থাকত।'

'আমার ইচ্ছে ছিল যেখানে বিগ্রহটা ছিল সে জায়গাটা একবার দেখে আসি। তোরা এমন তাড়াহুড়ো করে চলে এলি!'

'ভালো কথা',—রতন বলে উঠল—'তোর হঠাৎ ওই ছুরিটার ওপর চোখ গেল কেন?'

'ঠিক ওরকম একটা ছুরি একবার আমার প্রায় হাতে এসে গেস্‌ল, তাই।'

ডাকু বেপরোয়া ডানপিটে হতে পারে, কিন্তু বাজে গুল মারার অভ্যেস নেই সেটা আমরা জানি। কাজেই কথাটা শুনে আমরা দুজনেই বেশ অবাক। বললাম, 'কী ব্যাপার একটু খুলে বল্‌ত।'

ডাকুর কথা থেকে যা বেরোল তা মোটামুটি এই—

বছর দুয়েক আগে বর্ষার মুখটাতে ডাকু একা মহাগিরি রেঞ্জে শিকার করতে গিয়েছিল। কেয়ঞ্জর-জাজপুর রোড দিয়ে হেঁটে ফিরছিল রামচন্দ্রপুরে বাস ধরবে বলে। পথে বৃষ্টি নামে, ডাকু দৌড়ে গিয়ে কাছের একটা গ্রামে এক বুড়োর ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সে বুড়ো নাকি কামার, এবং ভারি ভালো লোক। সেই বুড়োর ঘরের দেয়ালে ঝোলানো একটা ছুরির ওপর ডাকুর চোখ যায়। দেবদের অস্ত্রাগারে দেখা পদ্মমার্কা ছুরির প্রায় ডুপ্লিকেট। সেইরকম সাইজ, সেইরকম ফলা, কেবল হাতির দাঁতের বদলে কাঠের হাতল। কিন্তু হাতলে অবিকল সেইরকম পদ্মচিহ্ন। ডাকু নাকি ছোরাটা অনেক করে কিনতে চেয়েছিল, কিন্তু বুড়ো কামার রাজি হয়নি। সে বলেছিল যে এই ছুরি ফলার ইস্পাত লোহার সঙ্গে একরকম বিশেষ ধাতু মিশিয়ে তৈরি হয়, এবং সেই মেশাবার কায়দা নাকি ওই বুড়ো কামারেরই এক পূর্বপুরুষ দৈবাৎ আবিষ্কার করে। এইসব ইস্পাতের জিনিস আগে কামাররা বানাত, রাজা জমিদার, সেনাপতি—এইসব বড় লোকদের জন্য। এখন এসবের কদর নেই, চাহিদা নেই, তাই বানানো বন্ধ করে দিয়েছে। ওই একটি ছুরি তাই অতি যত্নে রেখে দিয়েছে কামার।

ডাকুর এই বর্ণনা আমাদের দুজনেরই কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছিল—অবিশ্যি সেটা দুটো আলাদা কারণে। ডাকু থামলে পর আমিই প্রথম প্রশ্ন করলাম।

'গ্রামের নামটা মনে আছে তোর?'

'বাঃ, মনে থাকবে না?' ডাকু বেশ জোরের সঙ্গেই বলে উঠল কথাটা—'জগন্নাথপুর। কেন, তোর

যাবার শখ হয়েছে? ও ছুরি দেবে না বুড়ো।'

আমি ডাকুর কথা অগ্রাহ্য করে আরেকটা প্রশ্ন করলাম—'আর বুড়ো কামারের নাম?'

'বংশীধর পাত্র। আরো কিছু জানতে চাস?'

'না, জানতে চাইনা। যেতে চাই জগন্নাথপুর। তবে ছুরি হাত করতে নয়। ছুরিটা কীভাবে বানিয়েছিল বংশীধর পাত্র, সেটা জানতে। ভারতীয় ইস্পাত একদিন পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। শুধু তাই নয়—ইস্পাত তৈরির কৌশল প্রথমে ভারতেই আবিষ্কার হয়। ভারতীয় ইস্পাতের সাহায্যেই প্রাচীন মিশরীয়রা তাদের কঠিন পাথরের মন্দিরগুলো বানিয়েছিল। প্রাচীন যুগের কথা ছেড়ে দিলেও—ধর, এই একশো বছর আগেও সিপাই বিদ্রোহের পর সিপাইদের কাছে থেকে যে সব তুরি, তলোয়ার ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলে পরীক্ষা করে ইংরেজরা অবাক হয়ে যায়। শেষে কলকারখানার যুগ আরম্ভ হওয়ায় এইসব কামাররা মার খেয়ে যায়। কিন্তু এইসব কামারদের মধ্যে একজনেরও যদি সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাহলে, তার কাছ থেকে ইস্পাত তৈরির আশ্চর্য সব তথ্য পাওয়া যেতে পারে। বল ডাকু—জগন্নাথপুর নিয়ে যাবি?'

এবার রতন আমার প্রস্তাবে যোগ দিল। সে বলল, 'আমারও যাওয়া দরকার, কারণ আমারও বংশী কামারের সঙ্গে দরকার আছে। প্রতাপের কৌতূহল ঐতিহাসিক হিসাবে, আমার কৌতূহলটা জিয়োলজিস্টের। আমি জানতে চাই বংশী লোহার সঙ্গে কী ধাতু মিশিয়ে ইস্পাত তৈরি করে, এবং কোত্থেকে সে এই ধাতু পায়।'

ডাকু ভেবে বলল, 'বেশ, পরশু চল জগন্নাথপুর। কিসে যাবি? বাসে, না প্রাইভেট গাড়িতে?'

'বাসে নয়,' বলল রতন, 'কাকার গাড়িটা আমি ম্যানেজ করব।'

রামচন্দ্রপুর ছাড়িয়ে কিছুটা গিয়ে বাঁধারে মাইলখানেক দূরে জগন্নাথপুর গ্রাম। পিচ রাস্তা থেকে একটা গরুর গাড়ি চলার মেঠো, রাস্তা চলে গেছে গ্রামের দিকে। ওপথে মোটর যাবে না। তাই ঠিক হল, ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে বড় রাস্তার ধারে অপেক্ষা করুক, আমরা পায়ে হেঁটে চললাম গ্রামে।

গ্রামের সীমানায় আমাদের অভ্যর্থনা জানাল এক দঙ্গল ছোট ছেলেমেয়ে। সর্বাঙ্গে ধুলো। বিস্ফারিত দৃষ্টি। নির্বাক অভ্যর্থনা। ডাকু বলল, 'সোজা চল, একটা বড় বটগাছের ধারে বংশীর ঘর।' রাস্তার পাশে এক বাড়ির দাওয়ায় কয়েকজন লোক বসেছিল তারা হাঁ করে আমাদের দেখতে লাগল।

বটগাছ দেখলাম! সত্যি বিরাট। ডাল থেকে প্রচুর ঝুরি নেমেছে মাটিতে। যেন জটাজুটধারী মুনি একজন। গাছের ধারে ধারে কয়েকটি কুটির। ডাকু দেখাল, 'ওইটে বংশীর বাড়ি।'

দুঃখের বিষয় বাড়ির দরজায় তালা ঝুলছে। বুঝলাম বংশী কোথাও বেরিয়েছে। এদিক সেদিক চাইতে দেখি পাশের বাড়ির দরজা দিয়ে একটা মুখ উঁকি মারছে। ডাকু ডাকল তাকে।—'শুনুন।' লোকটি যেন ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে এল!

অস্থিচর্মসার ছোটখাট মানুষটি। বয়স বোঝা ভার। ডাকু জিজ্ঞেস করল। 'বংশী নেই দেখছি। কখন আসবে বলতে পারেন?'

'লোকটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের লক্ষ্য করছিল। এবার সে যে প্রশ্নটি ছাড়ল, তার জন্য আমরা একেবারে প্রস্তুত ছিলাম না। তীব্র খ্যানখ্যানে গলায়—'আজ্ঞে আপনারা কি পুলিশের লোক?'

সেকি! আমাদের পুলিশ ঠাওরাবার কারণ।

রতন বলল, 'না আমরা পুলিশ নই। বংশীর কাছে এসেছি একটা কাজে। একটা লোহার জিনিস ব, তাই।'

'ও।' লোকটি যেন হাঁফ ছাড়ল। সে কাছে এগিয়ে এল।

—'তা আপনারা আসছেন কোত্থেকে?' ডাকু বলল, 'কেওঞ্জর গড়। আমি ওখানেই থাকি। এরা দু'জন কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছেন। বংশীর খুব প্রশংসা শুনেছেন, তাই তার কাজ দেখতে চান।' 'এঁ্যা কলিকাতার লোক?' লোকটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। 'আজ্ঞে আমিও কলিকাতা ছিলাম চারবছর। হোটেলে কাজ করতাম। অসুখে ভুগলাম খুব তাই দেশে চলে এসেছি ছয়মাস হল।' লোকটি এতক্ষণ ওড়িয়ায় কথা বলছিল। এবার সে বাংলা-ওড়িয়ার জগাখিচুড়ি ছাড়ে। বলল, 'আজ্ঞে আমার নাম কার্ত্তিকচন্দ্র পণ্ডা। তা বংশীদাকে খোঁজ করছিলেন কিনা তাই ভাবিলাম আবার বুঝি পুলিশ এসেছে।'

ডাকু বলল, 'বংশীর কাছে বুঝি পুলিশ এসেছিল?'—'হ্যাঁ'।

—'কেন?'—'আর বলবেন না মশাই। গতকাল পুলিশ এসেছিল পঞ্চার খোঁজে। বংশীদাকে কি হয়রানিটাই না করল।'

'পঞ্চা কে?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'বংশীদার ছেলে। ইস্ অমন ভাল মানুষটা। ছেলের জন্যে মান ইজ্জত সব গেল।'

ডাকু বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ-বংশীর এক ছেলে আছে, বলেছিল সেদিন। তা পঞ্চা কি করেছে?'

'ডাকাতি মশায়!' কার্তিক গলার স্বর একটু নামায়। 'দেববাড়ির ডাকাতির কেসে পুলিশ ওকে খুঁজছে। এ নাকি ওর দলের কাজ। দেব-বাড়ির মন্দির ভেঙে ভীষণ ডাকাতি হয়েছে। সাংঘাতিক ছেলে মশাই পঞ্চা। গুণ্ডা বদমাস। আগে একবার মাস দুই জেলও খেটেছে। এবার ধরা পড়ে সারা জীবন জেলের ঘানি টানুক। শিক্ষে হোক বেটার।'

দেববাড়ির ডাকাতি ও বংশীর ছেলে! এ তো অদ্ভুত যোগাযোগ। আমি বললাম, 'বংশীর ছেলে বুঝি লোহার কাজ করত না?'

—'কেন করবে না,' বলল কার্তিক, 'আগে করত। বেশ কাজ শিখেছিল। তারপর কুসঙ্গে পড়ে নষ্ট হয়ে গেল। বংশীদা ওকে কত বুঝিয়েছে। বকেছে! কিন্তু ও ছেলে কি শোনার পাত্র। নেহাৎ মা-মরা একমাত্র ছেলে নইলে বাড়িতেই ঢুকতে দিত না বংশীদা। এখন আট-দশ দিন পঞ্চা হাওয়া। তারপর কাল এল পুলিশ।'

পঞ্চার কথা শুনতে আমার উৎসাহ হচ্ছিল না। 'বংশী কখন আসবে?' কার্তিক জানাল, 'ভোর থেকেই দেখছি বংশীদার ঘরে তালা মারা। কোথায় গেছে, কখন আসবে হয়তো পেল্লাদ বলতে পারে।'

—'কে পেল্লাদ?' 'আজ্ঞে বংশীদার অ্যাসিস্টান্ট। ভারি ভাল ছেলে।'

'পেল্লাদের সঙ্গে একবার দেখা করা যাবে?' বললাম আমি।

'নিশ্চয়। পেল্লাদ এ গাঁয়েই থাকে। ওরে এই ছোঁড়া। যাতো পেল্লাদকে ডেকে নিয়ে আয়। বল কলিকাতার বাবুরা ডাকছেন।' কার্তিক একটা ছোট ছেলেকে পাঠিয়ে দিল।

আমি লক্ষ্য করেছিলাম বটতলায় অনেকগুলো উনুন। ওগুলে লোহা গালাবার চুল্লী। সবই ভাঙা। শুধু একটা আস্ত আছে।

চুল্লী শক্ত মাটিতে তৈরি। তলাটা গোল। প্রায় তিন ফুট ব্যাস। তলা থেকে ওপরে গম্বুজের মত সরু হয়ে গেছে। চুল্লীর তলায় দুটো ফুটো! মাথাতেও ফুটো। রতনকে দেখিয়ে বললাম—

'এই হচ্ছে দেশী কামারদের আদিম চুল্লী। অবশ্য এর চেয়ে ছোট বা বড়ও হয়। তলার একটা ফু দিয়ে গলানো লোহার খাদ বেরিয়ে যায়। অন্য ফুটোটা দিয়ে চামড়ার হাপর চালিয়ে পাম্প করে ছে

হয়, আগুনের তাত তোলার জন্যে। আর মাথার ফুটো দিয়ে লোহার আকর এবং কাঠকয়লা ফেলা হয় চুল্লীর ভিতর জলন্ত কাঠের ওপর। কয়েক ঘণ্টা প্রচণ্ড আঁচে লোহা পাথর গলে যায়। তখন ভারি ধাতু লোহা নিচে জমা হয় এবং ওই পাথরে মেশা অন্য ধাতু বা খাদ ওপরে ভাসতে থাকে। সেগুলো বেরিয়ে যায় ফুটো দিয়ে। তারপর গলিত লৌহপিণ্ড বের করে হাতুড়ি দিয়ে বেশ করে পেটালে বাকি খাদ ঝরে গিয়ে থাকে প্রায় বিশুদ্ধ লৌহপিণ্ড। আর ইস্পাত বানাতে হলে ওই রকম খাঁটি লোহাকে আবার গলিয়ে তার সঙ্গে মেশানো হয় গুঁড়ো কাঠকয়লা অর্থাৎ কার্বন তৈরি হয় কার্বন-স্টিল।'

মনের আনন্দে লেকচার দিচ্ছিলাম। হঠাৎ খেয়াল হল, রতন শুনছে না। সে ডাকুকে লক্ষ্য করছে। ডাকু দেখি কার্ত্তিকের সঙ্গে বংশীর উঠানে বেড়াচ্ছে। একবার কানে এল পঞ্চার নাম। ওর মাথায় দেব বাড়ির ডাকাতি ঘুরছে নাকি? 'এই যে পেল্লাদ এসেছে।' কার্ত্তিক ডাকল। 'আয় আয়।' কার্ত্তিক কুড়ি বাইশ বছরের একটি যুবককে আমাদের সামনে হাজির করল। যুবকের স্বাস্থ্য ভাল। শান্ত মুখশ্রী। কাঁচুমাচু ভাবে এসে দাঁড়াল প্রহ্লাদ। আমি বললাম। 'তুমি বংশীর সঙ্গে কাজ কর?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

আমি এবার প্রহ্লাদকে বললাম। 'বংশীর লোহার কাজের খুব নাম শুনেছি, তাই এসেছিলাম দেখতে। কিছু জিনিস গড়াতে। তা বংশী গেছে কোথায়। জান?'

প্রহ্লাদ আমতা আমতা করে বলল। 'এখনও ফেরেনি বংশীজ্যাঠা। হয়তো কেল্লাপাহাড়ে গেছে। তবে তো ফিরতে দেরি হবে।'

ডাকু বলল, 'কেল্লা পাহাড়? সে কোথায়?'

—'ওই দিকে একটা ছোট পাহাড় আছে।' প্রহ্লাদ পশ্চিমে মহাগিরি রেঞ্জের দিকে দেখায়। 'সেই পাহাড়ের মাথায় আছে একটা পুরনো ভাঙা কেল্লা। ওই পাহাড়কে আমরা বলি কেল্লা পাহাড়। এখান থেকে তিনক্রোশ পথ। পলাশধুনি গাঁয়ের পাশ দিয়ে যেতে হয়। বংশীজ্যাঠা মাঝে মাঝে যায় ওই পাহাড়ে।'

'কেন?'

'জ্যেঠা বলে ওই পাহাড়ে নাকি তার পূর্বপুরুষ থাকত, তাই দেখতে যায়। আর'—প্রহ্লাদ হঠাৎ চুপ করে গেল।

'আর কি?' জিজ্ঞেস করলাম।

প্রহ্লাদ একটু ইতস্তত করে বলল। 'আর বংশীজ্যাঠা পাহাড় থেকে একরকম পাথর আনে।'

রতন বলল, 'পাথর? কি পাথর?'

'সে পাথর আমি চিনি না। একবার মাত্র দেখেছি।'

'লোহা পাথর?'

'না।' প্রহ্লাদ ঘাড় নাড়ে।

'ওই পাথর দিয়ে কি করে বংশী?' বলল রতন।

'ঠিক জানি না। তবে মনে হয় লোহার সঙ্গে মেশায়। তবে কি ভাবে মেশায় দেখায়নি কখনো।' প্রহ্লাদ উত্তর দেয়।

'তুমি গেছ কখনো ওই পাহাড়ে পাথর আনতে?' রতন জানতে চায়।

'না। আমি কখনো যাইনি কেল্লাপাহাড়ে।' বলল প্রহ্লাদ। 'বংশীর ছেলে গেছে?' এবার ডাকুর প্রশ্ন।—'হ্যাঁ তা গেছে। আমি যাই নি।'

'সেই পাথর আছে এখানে? দেখাতে পার।' রতন বলে। এত প্রশ্নের মুখে প্রহ্লাদ কেমন ঘাবড়ে যায়। আড়ষ্ট ভাবে বলে—'না নেই। কাজ হয়ে গেলে বংশীজ্যাঠা ওই পাথরের টুকরো দূরে ফেলে দিত। বেশি পাথর তো আনতো না। শেষবার এনেছিল বছরখানেক আগে। আর যায় নি।'

প্রহ্লাদ জানাল, 'কেল্লাপাহাড়ে গেলে বংশীজ্যাঠার ফিরতে রাত হয়ে যায়।'

আরও ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করলাম। নাঃ বংশী এখন ফিরবেনা। অগত্যা আর একদিন আসব বলে বাড়িমুখো রওনা দিলাম।

মন খারাপ। আজকের অভিযান ব্যর্থ হল। ডাকু রতনও চুপচাপ। মাত্র মাইল দুই গেছি। হঠাৎ দুম! মোটরের টায়ার ফাটল।

কি ঝামেলা। বাড়তি টায়ার অবশ্য আছে সঙ্গে। আমরা নামলাম। ড্রাইভার নতুন টায়ার লাগানোর তোড়জোড় করে জায়গাটার বাঁ পাশে পথের ধারেই এক ছোট পাহাড় ডাকু বলল, 'চ, ততক্ষণ পাহাড়ে বেড়িয়ে আসি। উত্তম প্রস্তাব। ডাকু বন্দুক নেয়—যদি সুযোগ পাওয়া যায় শিকার করব।

পাহাড়ে উঠছি। এদিক সেদিক ঘুরছি। এক জায়গায় পাহাড়ের ঢাল খাড়া নেমে গেছে অনেকখানি। আমি কিনারে গিয়ে নিচে তাকাতেই চমকে উঠলাম।

সোজা নিচে পাহাড়ের ওপর একটি মানুষের দেহ পড়ে আছে চিৎ হয়ে। কয়েক সেকেণ্ড লক্ষ্য করে বুঝলাম—নিশ্চল। তার দেহের অদ্ভুত ভঙ্গি দেখে সন্দেহ হল মরে গেছে নাকি?

রতন ও ডাকুকে দেখলাম। তারপর তাড়াতাড়ি নেমে গেলাম ঘুরে। কাছাকাছি গিয়েই ডাকু প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে—'একি, এ যে বংশী!' (ক্রমশঃ)

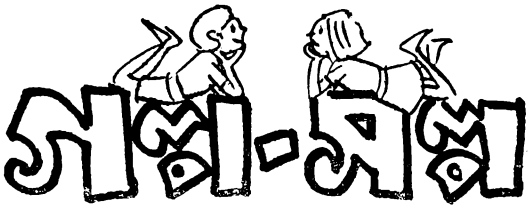

লীলা মজুমদার

তোমরা সকলেই বোধ করি চলচ্চিত্র দেখতে ভালোবাস। অনেক স্কুলে ও ক্লাবেও ছোটদের জন্য বিশেষ চলচ্চিত্র দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে ধর চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগেও বাড়িতে মা বাবারা আর স্কুলে মাস্টার মশাইরা প্রায় সকলেই মনে করতেন যে চলচ্চিত্র দেখতে গেলেই ছেলে মেয়েরা বখে যাবে; তাদের দিয়ে আর পড়াশুনো বা কাজকর্ম হবে না। এ রকম ভাবার অবিশ্যি একটা কারণ-ও ছিল। সে সময়ে বিদেশে যদি বা কিছু ছোটদের চলচ্চিত্র তৈরি হত, তার খুব অল্পই এ-দেশে আসত। আর এদেশে সবেমাত্র কয়েকটি দেশী ভাষার ছবি তোলা শুরু হয়েছিল, কিন্তু তার একটিও ছোটদের জন্য নয়। তবে দেশী বিদেশী কিছু ছবি তখনো ছিল, এখনো আছে যা বড়দের জন্য হলেও, ছোটরাও উপভোগ করতে পারে। আর সেকালের আমেরিকার কার্টুনের তো কথাই নেই।

সে যাই হক গে, চলচ্চিত্রের সাহায্যে যে কি সহজ ও সুন্দর ভাবে শিক্ষা বিস্তার করা যায়, তখন কেউ ভাবতেও পারে নি। হয়তো ডকুমেণ্টারি, বা তথ্যমূলক ছোট ছবি দেখেই শিক্ষকরা প্রথমে এ বিষয়ে সচেতন হলেন। এই চল্লিশ বছরের মধ্যে কত ছোট বড় যুদ্ধ হয়ে গেছে, দেশটা স্বাধীন হয়েছে, কত নতুন নতুন সমস্যা আর দায়িত্বের কথা উঠেছে। এই দিক দিয়েও চলচ্চিত্র যে ছোটদের কত কাজে লাগতে পারে, ভেবে অবাক হতে হয়। প্রথম কথা হল যারা লিখতে পড়তে জানে না, তারা ছবি দেখে বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি, কি না শিখতে পারে আর কত কম খরচে ও কম চেষ্টায় এবং কত আনন্দের সঙ্গে। আমোদ করায় আর শেখায় কোনো তফাৎ-ই থাকে না। তা ছাড়া বইতে পড়া শুকনো বিদ্যের চেয়ে যে-জিনিস চোখে দেখা যায়, কানে

শোনা যায়, সে-জিনিস খুঁটি-নাটি সুদ্ধ কত নির্ভুল ভাবে মনেও থাকে। আরেকটা মজা হল যে ভাষার হাঙ্গামা থাকে না। এক-ই ছবি নানা ভাষায় বলা যায় আর সে ভাষাও যারা বোঝে না, তারাও শুধু চোখে দেখে অনেকখানি শিখে নিতে পারে।

ভারতীয় শিশু চলচ্চিত্র পরিষৎ বলে একটা দল আছে, তাঁরা বেশ কয়েক বছর ধরে আমাদের দেশের গ্রামে গ্রামে নানান দেশী বিদেশী ছবি, প্রায় বিনি পয়সায় কিম্বা খুব কম খরচে দেখিয়ে বেড়ান। যেখানে বিজলি নেই সেখানে ব্যাটারির সাহায্য নেওয়া হয়। তাছাড়া বছরে একবার করে মস্ত বড় শিশু চলচ্চিত্র উৎসব আর আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতা হয়। এ বছরেও ১৩ই জানুয়ারি থেকে শিক্ষা-মূলক শিশু-চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয়েছল; আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতাও হচ্ছে ২২শে মার্চ থেকে, রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়মে। শিক্ষামূলক জিনিস যে কত আনন্দের ব্যাপার হতে পারে, এগুলি দেখলেই বোঝা যায়।

তোমাদের সম্পাদকরা যখন খুব ছোট ছিলেন তখনো সকলের মনে এই রকম একটা ধারণা ছিল যে যে-সব জিনিস করা ভালো, সেগুলো করতে ভালো লাগে না। আর যে-সব জিনিস করতে খুব মজা লাগে তার প্রায় সব-ই করা ভালো না। পড়ার বই যে কি খটমট ব্যাপার ছিল আর কি বলব! আর গল্পের বই পড়লে গুরুজনরা প্রায়ই ভারি বিরক্ত হতেন। এখন পড়ার বইতে আর গল্পের বইতে বিশেষ তফাত নেই। আর চলচ্চিত্র হয়ে উঠেছে মাস্টারমশায়দের ডান হাত।

বড়রাও যোগ দেবেন, অনেক জায়গায় এই বিষয় নিয়ে আলোচনা সভা বসবে। কিন্তু কোন ছবি সব চেয়ে ভালো সেটা বিচার করবে ছেলে-মেয়েরা নিজেরা। কি মজার কথা বল তো? তারা নানান্ অনুষ্ঠানে সভাপতিও হবে।

শুধু ছেলে-মেয়েরা, তাদের অভিভাবকরা আর শিশু চলচ্চিত্র পরিষৎ নয়, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার, উইনিসেফ ও নানান দেশী বিদেশী প্রতিষ্ঠান ও এ বিষয়ে উৎসাহী এবং নানান ভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত। শিক্ষা ব্যাপারটা ক্রমে কত আনন্দের ব্যাপার হয়ে উঠছে বল তো? কিন্তু তবু নামতা মুখস্থ না করলে চলবে না, এ-কথা ভুলো না।

এই ছোটদের চলচ্চিত্র নিয়ে সমস্ত পৃথিবীর লোকের কি উৎসাহ! এবছর ১০৫টি দেশ থেকে ১৪০০র বেশি ছবি আসছে। এগুলি নানান্ জায়গায় দেখানো হবে। ভারতের ৩৬২টি শহরের আর গ্রামের কেন্দ্রে ৪০৫০টি অনুষ্ঠান হবে। সম্ভবতঃ ৩৭ লক্ষেরও বেশি ছেলে-মেয়ে এগুলি দেখবে। ৮০টি গ্রামে চলচ্চিত্র উৎসব হবে, যেখানে বিজলি নেই। ভেবে দেখ সেখানকায় ছেলেমেয়েরা চলচ্চিত্র দেখে কি খুসিই না হবে আর নিজেদের চোখে নানান দেশের নানান আশ্চর্য ব্যাপার দেখতেও পাবে।

সোনা মুখার্জি

বিচিত্র দণ্ড

(একটি সত্য ঘটনা)

সেবার আমরা দক্ষিণ ভারত ঘুরতে গেছি। মাদ্রাজে অর্থাৎ তামিলনাড়ু গিয়ে মাদ্রাজ হাইকোর্ট দেখছি। সঙ্গে আমাদের গাইড হয়েছে শ্রীপি. পি. নারায়ণ আঙ্কেল। ইনিও মাদ্রাজ হাইকোর্টের জজ।

বিশাল বিশাল সব বিল্ডিং দেখে কেমন ভয় ভয় করছিল সত্যি বলছি। সামনে প্রাঙ্গণে কোনো প্রমাণ সাইজের বিরাট মর্মর মূর্তি।

আমি প্রশ্ন করলাম, 'আঙ্কেল, ইনি কে?' আঙ্কেল বললেন, 'ইনি ভারতীয় হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় প্রধান বিচারপতি; স্যার টি. মুত্তু (Muttu) স্বামী আয়ার। এঁর সুবিচারের বহু গল্প আছে। তার মধ্যে যেটা আমাদের সব ভারতীয়দের জানা উচিত সেটা তোমাদের বলছি।'—

তখন ভারত ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন সপ্তম এডোয়ার্ড।

সম্রাট এমন এক জঘন্য অপরাধ করেছিলেন যে সম্রাটের শাস্তি হওয়া উচিত এই বিষয়ে হাউস অফ্ কমন্স্ ও হাউস অফ্ লর্ডস্ একমত ছিলেন। কিন্তু কি শাস্তি দেওয়া যায় তা ঠিক করতে না পারায় আদালতে সম্রাটের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। সম্রাটও নিজ অপরাধ স্বীকার করেন।

আবার সেই প্রশ্ন ওঠে, কি শাস্তি দেওয়া যায়? তখন মামলার পূর্ণ বিবরণ দিয়ে বৃটিশ শাসনের অন্তর্গত সমস্ত উচ্চ আদালতে প্রশ্ন করা হয়, এই অপরাধে সম্রাটকে কি দণ্ড দেওয়া উচিত।

সম্রাটের বিরুদ্ধে শাস্তির বিষয়ে কোন আদালতই ন্যায় সঙ্গত উত্তর দিতে অপারগ হয়। যখন ইংল্যণ্ডের হাইকোর্ট হতাশ হয়ে পড়েছে তখন মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এই স্যার টি মুত্তু স্বামী আয়ার তাঁর নির্ভিক মতামত পাঠান। এবং তার রায়ই বৃটিশ হাইকোর্ট মেনে নেয়।

তিনি লিখেছিলেন, ন্যায় বিচারের সামনে শাসক শাসিতের কোনো পার্থক্য নেই। অপরাধী সম্রাট হন বা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই হন, তিনি দণ্ডনীয়। কারণ অপরাধ তো অপরাধই। সুতরাং অপরাধীর উচিত শাস্তি হওয়া উচিত।

সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডকে এমন শাস্তি দেওয়া উচিত যা শতাব্দীর পর শতাব্দী লোকের মনে থাকে। আমার মতে অন্ততঃপক্ষে এক কোটি মুদ্রায় সম্রাটের মুকুটহীন মূর্তি ছাপা হক। উচ্চ বংশীয় ব্যক্তির এর থেকে বড় শাস্তি আর হতে পারে না। এর অতিরিক্ত অন্য কোনো শাস্তির প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। বৃটিশ হাইকোর্ট এই দণ্ডই সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডকে দেন।

এই ন্যায় বিচারের জন্য স্যার টি মুত্তু স্বামী আয়ারকে সম্মান দেখাবার জন্য বৃটিশ সরকার মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রাঙ্গনে তাঁর এই মূর্তিটি তৈরি করেন।

সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের মুকুটহীন টাক মাথা ছবিআলা পুরনো টাকা তোমরা কি দেখেছ? না দেখলে, যাঁরা পুরনো টাকা জমান তাঁদের কাছে খুঁজলে নিশ্চয়ই দু একটা দেখতে পাবে।

সবুজ ও অবুঝ

জীবন সর্দার

আমার নজর ছিল শুঁয়োপোকাটির দিকে, প্রজাপতিটার দিকে নজর ছিল দোয়েলটার। আমরা চারজন একটি পেয়ারাগাছের চার ডালে বসে। আমার বাঁদিক থেকে একটু হাওয়া এলো। তখনই প্রজাপতিটা একবার বাঁদিকে গিয়ে ফের ডানদিকে উড়ে গেল। দোয়েলটা কোনাকুনি উড়ল তাকে ধরতে। আমিও আর দেরী না করে শুঁয়োসুদ্ধ পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে বোতলে রাখলাম।

আমার মতলব ছিল এই শুঁয়োটি একটি পেয়ারা পাতা খেতে কত সময় নেয় তা' দেখা। লালমাথা গাঢ় খয়েরী শরীর ছিল শুঁয়োটির। দেখতে ছোট হলে হবে কি একটি বড় পেয়ারা পাতা খেয়ে ফেলল সতের ঘণ্টায়। আমি ভাবলাম বিকেলে ওকে পেয়ারা গাছটিতে রেখে দিয়ে আসব। ততক্ষণ না হয় সে দূর্বাঘাস খেয়ে কাটাক। কিছু ঘাস ছিঁড়ে তার বোতলে ভরে কাজে চলে গেলাম। সারাদিন বাইরে কাটিয়ে বিকেলে ফিরে দেখি ঘাসের মনে ঘাস পড়ে আছে শুঁয়ো রয়েছে শুকিয়ে না খেয়ে। আহা ওটি বোধ হয় ঘাস খায় না, তাই ঘরের বাইরে জবা গাছের পাতা এনে রেখে দিলাম তার মুখের কাছে। তাও খেলনা শুঁয়োটি। অথচ বিকেলেই একটি শুঁয়োকে জবা পাতা খেতে দেখেছি। ভোর না হতেই উপবাসী শুঁয়োটিকে পেয়ারা গাছে রেখে এলাম। ফেরার পথে জবা গাছের কাছে থামতে হলো।

যে শুঁয়োটি জবা গাছে দেখেছিলাম তাকে খুঁজে বার করতে সময় লাগল। তার রঙ খয়েরী ছিল না। ছিল সবজে, পাতার রঙে মিশে গিয়েছিল ওটি। জবা গাছের শুঁয়োটিকে নিয়ে আমি ঘরে এলাম না; নতুন একটি ভাবনা নিয়ে ঘরে এলাম—গায়ের রঙ আলাদা বলে শুঁয়ো দুটো আলাদা গাছের পাতা খাচ্ছে, না বিশেষ পাতা বিশেষ রঙের শুঁয়োপোকার খাদ্য। ভেবে ভেবে এর উত্তর না পেয়ে দেখে শুনে এর উত্তর খুঁজতে বেরলাম।

চেনাশুনা গাছগুলোর পাতায় আগে খোঁজ নিলাম। তারও আগে কোন্ কোন্ গাছে খোঁজ নেব তার নাম গুলো লিখে নিলাম এইভাবে :

বট অশথ তেঁতুল। শাল তাল বাঁশ ঘাস। আখ পাট ধান বেগুন।
আম কাঁটাল কুল॥ সজনে কুমড়ো অমলতাস॥ পান পদ্ম শিউলী সেগুন॥

গাছগুলোর নাম মনে রাখবার জন্যেই গাছের ছড়া লিখেছিলাম। আরও একটা উদ্দেশ্য—ফল গাছ ফুল গাছ ছায়ার গাছ শস্য গাছ—সব গাছের কাছেই যেন খবর নিতে পারি।

কাজটি যত সহজ ভেবেছিলাম, তত সহজ নয়। বট অশথ আম তেঁতুল গাছে সবজে শুঁয়ো যেমন পেয়েছি, কোনো কোনোটিতে এমন শুঁয়ো পেলাম যাদের গায়ে নানা রঙের বাহার। কারো গায়ে ডোরা ডোরা দাগ, আবার কারো গায়ে রঙের ফোঁটা।

হলুদ খয়েরী সবুজ আর গোলাপী এই চার রঙের শুঁয়ো দেখলাম বাঁশ বা ঘাস জাতীয় গাছের পাতায়। আখ ধান কাশ এদের পাতায়ও ঠিক ঐ রঙের শুঁয়ো। এদের গড়ন যেন একটু আলাদা লেজ আর মাথার দিকটা সরু, পেট মোটা। ভালুকের মত লোমওয়ালা শুঁয়ো দেখতে পেয়েছি শিউলী গাছে, আবার শাল গাছেও। মাথায় শিংওয়ালা শুঁয়ো কুমড়ো পাতায় দেখতে পেলাম একবার, অন্য আর একটিকে দেখি স্থলপদ্ম পাতায়। এত বিচিত্র রঙ ও গড়ন দেখে দেখে আমার ধাঁধা লেগে গেছে।

আমি চাইছি এই বসন্ত ঋতুতে সব প্রকৃতি-পড়ুয়া এই কাজে চোখ লাগাক, আমাকে সাহায্য করুক। সবজী বাগান, ফুলের বাগান আর ফলের বাগানের গাছের পাতায় পাতায় খোঁজ কর শুঁয়ো দেখতে পাও কিনা। তাদের রঙ ও গড়ন কেমন লক্ষ্য কর। আরও দেখ, অন্য প্রাণী—পোকা আর পাখির সাথে তাদের সম্পর্ক কি! সব লিখে তারপর প্রকৃতি-পড়ুয়ার দপ্তরে পাঠিয়ে দাও।

শীতের সফর॥ [ন'জন প্রকৃতি-পড়ুয়া গত শীতে রূপনারায়ণের তীরে সফরে গিয়েছিল। মেঠো-পথ, গ্রামের পথ দিয়ে যেতে যেতে আর নদীর চরায় গিয়ে তারা কি দেখেছিল সে বর্ণনা তিনজন 'পড়ুয়ার' মেঠো খসড়া থেকে তুলে দিলাম। জী. স.]

মেঠো পথে : অলোক বন্দ্যোপাধ্যায় : দেউলটি স্টেশনে নেমে আমরা উত্তর দিকে হেঁটে যাচ্ছি। আমরা মানে ন'জন প্রকৃতি-পড়ুয়া। চারিদিক এখন থমথমে, চুপচাপ গাছের ডালে আর পথের দুপাশে চোখ রেখে হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'লো।

মাঠের মাঝখানে ছোট্ট একটা ঢিপির ওপর একটা মেঠো চিল বসে আছে। দূরবীণ চোখে লাগাতেই দেখলাম তার গায়ের পালকে ছাই ছাই সাদা, শুধু ডানার ডগায় একটুখানি কালো। চিলটা মাটি থেকে এক হাত উঁচুতে উঠে একই জায়গায় স্থির হয়ে ডানা ঝাপটাতে লাগল। মাথাটা নীচের দিকে নুইয়ে রাখা। নীচেই খানিকটা জায়গা জুড়ে বড় বড় ঘাস গজিয়েছে। চিলটা সেই ঘাসের আড়ালে নেমে গেল। সেখানে কি হচ্ছে দেখতে পেলাম না। একটু পরেই চিলটা আমাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল গ্রামের দিকে। বেশিদূরে নয়, কাছেই একটা গাছের ডালে বসে, ডানা মেলে ঝটপট করে একটা সরু ডাল ভেঙ্গে নেবার চেষ্টা করছে দেখতে পেলাম। একটু পরেই ওকে ফিরে আসতে দেখলাম, ঠোঁটে একটা সরু কাঠি। যে গাছের উপর দিয়ে চিলটা উড়ে গেল তার নিচে দাঁড়িয়ে ওর ছবি তোলা হল। আমাদের মাথার ওপর এসে চিলটা ডানা মেলে দিয়ে একবার পাক খেল, তারপর আবার ফিরে গেল মাঠের গাছটায়—এ গাছেই বোধহয় ওর বাসা হবে।

আমরা আবার এগিয়ে চলেছি। রাস্তার বাঁদিকে এমন ঘন গাছপালা। হঠাৎ একটা গাছের ডালে চড়ুইয়ের মত বড় দুটো পাখি দেখতে পেলাম। ঠোঁট মাথা আর চিবুক কালো রঙের। গায়ের রং ছাই। দু'গাল সাদা। ওঃ রামগাংরা দুটোই গাছের ডালে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে আর মাঝে মাঝে ঠোকরাচ্ছে বাকলে, নারকেল গাছের খাড়া গা বেয়ে উঠছে কাঠঠোকরার মত। রামগাংরা যে বেশ চঞ্চল পাখি একবার দেখেই বুঝতে পারছি। আমরা এবার মাঠ ছেড়ে গাছপালায় ঢাকা গ্রামের পথ দিয়ে এগিয়ে চললাম।

গ্রামের পথে : উজ্জ্বল চক্রবর্তী : আমাদের চোখ গাছের ডালে আর আকাশে। একটা বড় অশথ গাছের ডালে, পরগাছার অসংখ্য লাল ফুলের ফাঁকে চোখে পড়ল হলুদ বুক মৌচুষি—সমানে লাফিয়ে চলেছে এফুল থেকে ওফুল। বেশ কয়েকটা ঘুঘু, একটি সিপাহী ও নীলকণ্ঠ দেখতে পেলাম সেখানে। মাঝে মাঝে বেনে-বৌ এর ডাক শুনতে পাচ্ছি। এই শীতের দুপুরে কোকিলের ডাকও শুনতে পেলাম, দেখতে পেলাম

ছেলে ও মেয়ে দু'জাতের কোকিলকেই। যেতে যেতে পথের পাশে একটি কচুরি পানায় ঢাকা একটি পুকুরে দেখতে পেলাম একটা বড় পাখি। লম্বা পা দুটি পানায় পাতার ওপরে সাবধানে ফেলে হেঁটে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে লম্বা ঠোঁট দিয়ে পানার ধারগুলো উল্টে দেখছে। ওর পিঠের রঙ ময়ূরের ডানার মতন গাঢ় নীলচে কালো, গলায় বেগুনীআভা, চোখের ওপরে সাদা ডোরা।—জলপিপি—মুরগীর মত চাউনিটা সবসময় নিজের পায়ের গোড়ায়। এর আঙুলগুলো ভীষণ লম্বা আর সরু। কচুরি পানার ওপর হেঁটে হেঁটে জলপিপি খাবার খুঁজছে—এটা দেখলাম কিছুক্ষন ধরে আর ছবিও তোলা হ'লো।

গ্রামের মধ্যে দিয়ে হাঁটছি, দেখি খেজুর গাছে সবুজ রঙের বড় বসন্তবৌরি গ্যাঁজানো রস খাচ্ছে। শরৎচন্দ্রের বাড়ির পাশ দিয়ে গিয়ে, ক্ষেতের আল ধরে হেঁটে, কয়েকসারি বাবলা গাছ পেরিয়ে আমরা এবারে রূপনারায়ণের ধারে পৌঁছে গেলাম।

নদীর জলে অনেক বড় বড় চরা পড়েছে। চরায় গাংচিল আর কাদাখোঁচারই ভিড় বেশি। নদীর পাড় খুব খাড়াই আর তার নরম মাটিতে ছোট ছোট গর্ত। কয়েকটা কাঁকড়া সেখানে ঘুরছে—কেউ কাছে গেলেই চট করে গর্তে ঢুকে পড়ছে। পরে দেখলাম ওদের ধরতে হলে গর্তের পাশে অপেক্ষা করতে হয় যাতে গর্ত থেকে বেরলেই ধরা যায়। বেশ কয়েক রকম কাঁকড়া ধরা পড়ল। এক জাতের দেখলাম একটা দাঁড়া খুব বড়, তার রঙ কমলা কিন্তু অন্যটা একেবারে ছোট। অন্য একজাতের দুটো দাঁড়াই সমান। বেশি সংখ্যক কাঁকড়ার গায়ের রঙ মাটির মত—তাই সহজে দেখা যাচ্ছেনা।

চরের ওপর একজন পাখি শিকার করছিল। যখন সে শিকার করা পাখি নিয়ে ফিরল, দেখলাম ওগুলো সব হাঁস। খয়েরী মাথা, চোখের সামনে গাল আর চোখের পেছনে মাথায় গাঢ় সবুজ রঙের একটা ধারা। ডানা খয়েরী সাদায় মেশানো। নাম বললে—'বেগড়ী'। রূপনারায়ণের ধারে একটা বাবলা গাছের নীচে আমরা বিশ্রামের জন্য বসলাম।

রূপনারায়ণের চরে : কুশল মুখোপাধ্যায় : দু'জন প্রকৃতি পড়ুয়া রইল বাবলা গাছের ছায়ায় ছোট নৌকো করে আমরা তিনজন পড়ুয়া নদীর মাঝে সেই চরে নামলাম। সেখানে মাটি এত নরম যে আমাদের পা সেই কাদায় খানি ডুবে যেতে লাগল। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল চরে পাখির ছবি তোলা আর 'বালুর ঢেউ' দেখা। বেশ কয়েক জাতের পাখি আমাদের কাছাকাছি ছিল। একটা ছোট বক জলের ধারে শিকারের আশায় দাঁড়িয়ে ছিল। বকটা গোবকের থেকে খানিকটা বড়। সব পালকের রঙ সাদা। ঠোঁট ও পা' কালো। কয়েকটা গাঙচিল দেখলাম খুব সাহসী। ছবি নেবার জন্য একটা গাঙচিলের খুব কাছে গিয়েছিলাম, সে আমাদের লক্ষ্য করলেও উড়ে পালালো না। গাঙচিল গুলোর প্রায় সব পালকই সাদা। চোখের পেছনে একটা কালো ছোপ। ডানার ধার কালো ও সেই কালোর ওপর একটু সাদা ছোপ। একটা লেজ চেরা গাঙচিল এলোমেলো ভাবে ডানা ঝাপটে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। কয়েকটা কাদাখোঁচা আশেপাশে কাদার ভেতর খাবারের খোঁজ করছিল। কাছে যেতেই তারা ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। চরার পশ্চিম ধারে এক ঝাঁক সরাল বসেছিল, চোরাবালির ভয়ে তাদের কাছে যেতে পারলুম না। কাদায় গায়ে হাওয়া ও জলের ঢেউয়ের কারুকার্য দেখে আমরা তীরে ফিরে এলাম।

(১) কুনাল গাঙ্গুলী, ১০৫৮, বয়স ১৩

তুমি জানতে চেয়েছ সন্দেশের গ্রাহক কত। সব নিয়ে হাজার দশেক হবে। তার বেশির ভাগই স্কুল, লাইব্রেরি ইত্যাদি।

পত্রবন্ধু চাই। শখ ঃ—গল্পের বই পড়া, গল্প লেখা, কার্টুন আঁকা হকি ক্রিকেট খেলা, ডাক-টিকিট ও দেশলাই বাক্সের ছবি সংগ্রহ।

(২) নন্দলাল মাহাতো, ৯২৭, বয়স ১৪½

ভাই, খেলাঘরের সম্পাদককে চিঠি লিখে গ্রাহক হওয়ার কথা জেনে নিও। পত্রবন্ধু চাই; শখ ঃ—পত্রিকা পড়া, খেলা ধূলা, গান বাজনা।

(৩) অভিজিৎ চৌধুরী ৪৬৯, বয়স ১৪

দেখতো শয়তানের মোটর গাড়িতে ছবিতে স্বাক্ষর আছে কি না। ১৩৩৮ মানে ৪২ বছর আগের কথা, তোমাদের সম্পাদক মশাই তখন আঁচড় কামড় দিতে পারলেও ও ছবি কি আর এঁকেছেন? তবে ঘোড়ার ট্র্যাম তোমাদের সম্পাদিকাও দেখেন নি, যদিও মিড-ডে ফেয়ার দেখেছেন।

(৪) অশোককুমার বিশ্বাস, ১০২১, বয়স ১২

গ্রাহক কার্ড শেষ পর্যন্ত পেয়েছ আশা করি, পাঠানো হয়েছিল। প্রত্যেক বছর এত বেশি পূজা সংখ্যা ডাকে হারায় যে আগে থেকেই আমরা তোমাদের জানিয়ে দিই হয় হাতে হাতে নিও, নয়তো রেজিস্ট্রার করার খরচের ডাক টিকিট পাঠাও। তা হলে হারায় না। ভাই, তোমাদের সম্পাদক হলেন পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে কাজের মানুষদের মধ্যে একজন। ছবি আঁকা শেখাবার সময় কোথায় পাবেন?

(৫) বাদল চট্টোপাধ্যায়, ৮৮২, বয়স ১৩½

ডাক-ওয়ালারা তোমার পোস্ট-কার্ডে সম্ভবতঃ হিংসে করে, হয় বৃষ্টির জল নয় চোখের জল ঢেলে দেওয়াতে, পিছন দিকটা পড়া গেল না। মনে হল উপেন্দ্রকিশোরের গল্প পড়তে চাও। জান বোধ হয় যে এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি তাঁর সমুদয় লেখার, অর্থাৎ ছোটদের জন্য লেখার সংগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তা ছাড়া নানান্ প্রকাশালয় থেকে তাঁর গল্পের ছোট ছোট সংগ্রহ পাওয়া যায়। আমরাও সন্দেশে মাঝে মাঝেই ছেপে থাকি।

(৬) কৃষ্ণা সরকার, ৭৫৯, বয়স ১৩

গ্রাহক কার্ড পেয়েছ আশা করি? প্রায় সবাই টাকা চায় বলে বই দেওয়া হয় না। তোমার আগের চিঠি সময়মতো পাই নি, ভাই। বই নিয়ে এলে নিশ্চয় স্বাক্ষর করা যাবে।

(৭) অনীতা চট্টোপাধ্যায়, ২৫৯৮, বয়স ১৭

সাধারণ বিভাগের জন্য সুন্দর ও সহজ কবিতা লিখে পাঠাও না কেন? বয়স বাড়াতে কি এমন আছে? জান, আমাদের বয়সও প্রতি এক বছর করে বাড়তে বাড়তে, শেষটা একদিন—যাক সে কথা।

(৮) শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়, ৪৩৬, বয়স দাও নি কেন?

উত্তর পেতে হলে যে বয়স ও গ্রাহক সংখ্যা দুই-ই দেবার নিয়ম।

(৯) চিন্ময় ভট্টাচার্য, ২৩৯৬, বয়স ১৫

নিয়মিত চাঁদা যে দেয়, সেই গ্রাহক থাকে। এখনকার ধারাবাহিক গল্প দুটি কেমন লাগছে? ভালো লেখা জোগাড় করবার সর্বদা চেষ্টা করি, ভাই। গুপি পানুর বিষয়ে আরো গল্প থাকবে বই কি। প্রকৃতি পড়ুয়া হবার জন্য আলাদা চাঁদা দিতে হয় না। চিঠির ওপরে 'প্রকৃতি পড়ুয়া' লিখে দিলেই আমরা জীবন সর্দারকে দিয়ে দেব। পত্রবন্ধু চাই, শখ:—ডাক টিকিট সংগ্রহ, ক্রিকেট, মাছ ধরা আর বই পড়া। বিঃ দ্রঃ উপেন্দ্রকিশোরের ভাইদেরও ঠিক ঐ শখগুলোই ছিল।

(১০) শিবাজী সেনগুপ্ত, ২৪৩২, বয়স ১৪

তুমি আমাদের শুভেচ্ছা জেন। নতুন ধারাবাহিক গল্প কেমন লাগছে?

পৌষ মাসের ধাঁধার উত্তর।

(১) বন্দুকের ঘোড়া, কলের পুলি (Pulley) করাতের দাঁত চিরুণীর দাঁত আর ঝর্ণা কলম (কেউ কেউ পুলি বলতে পুলিশ অথবা আন্দামানের প্রধান নগর লিখেছে। শেওড়াপুলি (ফুলি) লিখলে ভুল ধরা হয়েছে।)

(২)

ইস্টবেঙ্গল : মোহনবাগানের সঙ্গে ড্র ব্যতীত অপর সব খেলায় জয়ী

প্রমাণ : ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান অপরাজিত দল। সুতরাং উভয়ের মধ্যে খেলা ড্র। অন্যদিকে তালিকা অনুযায়ী ইস্টবেঙ্গল একটি খেলা বাদে সব কটিতে জয়ী।

এরিয়ান্স : রাজস্থানের সঙ্গে ড্র ব্যতীত সব খেলায় পরাজিত।

প্রমাণ : রাজস্থান ও এরিয়ান্স কোন খেলায় জয়ী হয় নি। সুতরাং উভয়ের মধ্যে খেলা ড্র। আবার তালিকা অনুযায়ী একটি খেলা বাদে সবকটিতেই এরিয়ান্স পরাজিত।

মোহনবাগান : ইস্টবেঙ্গল ও বি. এন, আর এর সঙ্গে ড্র। অপর সব খেলায় জয়ী।

প্রামাণ : তালিকা অনুযায়ী দুটি ড্র বাদে সবখেলাতেই মোহনবাগান জয়ী। দুটি ড্রর মধ্যে একটি যে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে তা আগেই দেখান হয়েছে। অপর ড্রটি মহাঃস্পোর্টিং এর সঙ্গে হতে পারে না, কেননা মহাঃস্পোর্টিং কোন ড্র করে নি। এরিয়ান্সের সঙ্গেও হতে পারে না কেননা, রাজস্থানের সঙ্গে ড্র ব্যতীত এরিয়ান্সের সব খেলাতেই পরাজিত ; এমন কি রাজস্থানের সঙ্গেও হতে পারে না, কেননা রাজস্থানের দুটি ড্রর একটি এরিয়ান্সের সঙ্গে ; অপরটি যদি মোহনবাগানের সঙ্গে হয় তবে বি, এন, আর এর দুটি ড্রর কোন হিসাব পাওয়া যায় না। সুতরাং মোহনবাগানের সঙ্গে বি, এন, আর এর ড্র। আবার তালিকা অনুযায়ী মোহনবাগান দুটি ড্র বাদে সব খেলাতেই জয়ী।

মহাঃস্পোর্টিং : ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের নিকট পরাজিত। অপর তিনটি খেলায় জয়ী।

প্রমাণ : ইস্টবেঙ্গল ও বি, এন, আর ব্যতীত সবার বিরুদ্ধেই মোহনবাগান জয়ী। অতএব মহাঃস্পোর্টি এর বিরুদ্ধে মোহনবাগান জয়ী। অন্যদিকে মোহনবাগান ব্যতীত সবার বিরুদ্ধেই ইস্টবেঙ্গল জয়ী। সুতরাং মহাঃস্পোর্টিং এর বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল জয়ী। আবার দুটি পরাজয় ব্যতীত সব খেলাতেই মহাঃস্পোর্টিং জয়ী।

রাজস্থান : এরিয়ান্স ও বি, এন, আর এর সহিত ড্র। অপর সব খেলায় পরাজিত।

প্রমাণ : তালিকা অনুযায়ী দুটি ড্র ব্যতীত সব খেলাতেই রাজস্থান পরাজিত। দুটি ড্রর একটি যে এরিয়ান্সের সঙ্গে তা আগেই দেখান হয়েছে। অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও মহাঃস্পোর্টিং যে রাজস্থানের সঙ্গে ড্র করে নি তাও দেখান হয়েছে। অতএব, রাজস্থানের অপর ড্রটি বি, এন, আর এর সঙ্গে।

বি, এন, আর : রাজস্থান ও মোহনবাগানের সঙ্গে ড্র। এরিয়ান্সের বিরুদ্ধে জয়ী। ইস্টবেঙ্গল ও মহাঃস্পোর্টিং এর নিকট পরাজিত।

প্রমাণ : সবই আগেই দেখান হয়েছে।

(এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অনেক গ্রাহক সঠিক ফলাফল বের করতে পারলেও খুব কম গ্রাহকই সঠিক যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পেরেছে।)

(৩) পাহাড় (রামদাস—হনুমান গন্ধমাদন পাহাড় বহন করে নিয়ে এসেছিল।)

(৪) শ্যামবাবুর বয়স ৪৫ এবং রাম বাবুর ৫৪।

উত্তর দাতাদের নাম :—

যাদের সব কটি উত্তর ঠিক হয়েছে :—

২৯৫ শর্মিলা ও শ্রেয়া দত্ত, ৬২৯ কিশলয়, করবী ও কৌশিক ঘোষ, ৭৫৯ কৃষ্ণা সরকার, ৮৪৯ পান্থ দাশগুপ্ত ৮৬১ পুরোদীপ সব পেয়েছির আসরের ভাই বোনেরা ৯২৯ নীলাঞ্জন চৌধুরী ১০৭২ অনুপা ও অনুশ্রী ভট্টাচার্য,

১৬১৫ পথিকৃৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৫১ হাম্বীর মজুমদার ২২০২ শুভাশীষ ধর, ২৩৪৩ ঝামাপুকুর সম্মিলনী গ্রন্থাগারের সভ্যবৃন্দ, ২৪৭৮ সুস্মিতা মিত্র, ২৫৫৭ বিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায়, ২৭৬৩ শর্মিলা বসু ; সন্ধ্যা, বিপাশা, বাসু, সবিতা, সীমা, পালপুর শুভঙ্করী নিঃ বুঃ বিদ্যালয়, ২৪ পরগণা জেলা।

আর একটি নাম-নম্বর হীন উত্তর দাতা।

তিনটি উত্তর ঠিক ও একটি প্রায় ঠিক :—

৩৯৩ দেবাশীষ বন্দনা ও জ্যোতির্ময় বরাট, ৬০৩ শর্মিলা মজুমদার ৬৮১ চণ্ডীচরণ ব্যানার্জী, ৭৬২ গৌতম ঘোষ, ৮৩২ অর্পণ দাশগুপ্ত, ৮৭০ সুতপা ও শান্তনু চক্রবর্তী, ৯৫৩ সজল নীলিমা ও জয়শ্রী বর্মা, ১৮৬৩ সোনালী লাহিড়ী ২৮১৯ সৌমিত্র সেনগুপ্ত।

খুকু, চম্পা, মেরী, রাণী, জেসমিন, মিলি, শাহপুর জুনিয়র হাইস্কুল, ছোট সাটুই প্রাঃ স্কুলের ছাত্রবৃন্দ।

তিনটে ঠিক অথবা দুটো ঠিক, দুটো প্রায় ঠিক

৬৪৬ অবন্তিকা গুপ্ত, ৭০৩ প্রতীতি ও প্রতীক ভট্টাচার্য, ৭৩৭ প্রকৃতি মুখার্জী, ৯২৮ হেমন্ত, ইরা ও অনন্ত ভাদুড়ী, ৯৬২ অলকানন্দা ভট্টাচার্য, ১১৮১ অমিতাভ বর্মণ, ১৪৪৬ অনুরাধা ও অভিজিৎ সিংহ, ১৯৬২ প্রদীপ, বিদ্যুৎ ও জ্যোতি পারেখ, ২১৯৬ মিঠু কুকাই ও বিলু ঘোষ, ২৭৫১ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, ২৯৫৯ সুস্মিতা ঘোষ।

দুটো ঠিক ও একটা প্রায় ঠিক বা একটা ঠিক, তিনটে প্রায় ঠিক

৩২১ অজন্তা ও বন্দিতা ঘোষ, ৫৭৮ তরুণ সংঘের সভ্যবৃন্দ, ১১২২ বিশ্বজিৎ ও অভিজিৎ চৌধুরী, ১৬০৩ নিশীথরঞ্জন নীতীশরঞ্জন সমীর মিতালী ও জয়ন্ত গুহ, ২০৯০ সৌম্য রায়, ২২১৫ শুভা মজুমদার।

মুর্শিদাবাদ জেলা—টুটুলকুমার দাশ ভৈরবটোলা ফ্রি প্রা স্কুল, কাজল চৌধুরী, কৃষ্ণমাটি স্কুল, ছাত্রছাত্রীরা, পিলসীমা ফ্রি বোর্ড প্রাঃ স্কুল।

আর একটি নাম নম্বর হীন উত্তর-দাতা।

দুটো ঠিক, অথবা একটা ঠিক আর দুটো প্রায় ঠিক :—

৪৬৬ স্বাগতা মিত্র, ৮৬৩ সোমা রক্ষিত, ৯৫৭ ধ্রুবনারায়ণ দত্ত, ৯৯২ নির্মলকান্তি দত্ত, ১১২৬ অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী।

২৪ পরগণা জেলা—দীপালী দাস, জলেশ্বর উদ্বাস্তু প্রাথমিক বিদ্যালয় ; সুশান্ত, মুরারি, নিমাই, মনতোষ, দেবদাস, লক্ষ্মী, বিভুতি, দীনবন্ধু, হিমাংশু, অর্জুন, মন্মথ নগর ভবেন্দ্র ফ্রি প্রাঃ স্কুল।

মুর্শিদাবাদ জেলা—ছাত্রবৃন্দ পার্বতীপুর নিঃ বুঃ বিদ্যালয় ; বিভাসচন্দ্র মণ্ডল, রায়পুর ফ্রি প্রাঃ স্কুল ; অনিলকুমার স্বর্ণকার, ছোটবাথান প্রাঃ স্কুল ; হবিবুর রহমান মল্লা পাড়া প্রাঃ স্কুল।

দেরীতে পাওয়া উত্তর—সব কয়টি ঠিক :—৩৬৫ দেবাশীষ, সুদীপা ও সুওপা রায়।

দুটো ঠিক ও একটা প্রায় ঠিক—৫১০ সুজয় ও সংযুক্তা সোম, গীতা মাহাতো, খামার উঃ প্রাঃ স্কুল, পুরুলিয়া জেলা।

দুটো ঠিক বা একটা ঠিক ও দুটো প্রায় ঠিক—২২৬ জয়ন্ত ও প্রবাল নন্দীরায়, ১০৪৬ মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায়—

অজয় হোম

শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট সফর প্রায় শেষ হয়ে এল। দুটো বেসরকারী টেস্টম্যাচ শেষ হল। এই সফরে সবচেয়ে ভালো ব্যাটিং করেছেন অশোক মানকর। তিনি আগের চেয়ে একটু রোগা হয়েছেন। তার ফলে খেলাও ভালো হয়েছে এই রকম ব্যাটিং-এ শৌর্য রাখতে পারলে তাঁর মতো দলের মাঝের খেলোয়াড় বর্তমানে ভারতে আর কেউ নেই। তিনি স্বচ্ছন্দে সারদেশাই-এর স্থান নিতে পারবেন।

শ্রীলঙ্কার সবচেয়ে দোষ খারাপ আম্পায়ারিং। আম্পায়ার আলান ফেলসিংগার পাকিস্তানের ইদ্রিস বেগকেও হার মানায়। শ্রীলঙ্কার পণ কিছুতেই ভারতকে জিততে দেব না। তা সত্ত্বেও প্রথম টেস্ট ভারত অমীমাংসিতভাবে শেষ করে, আর দ্বিতীয় টেস্ট জেতে ৬ উইকেটে। তোমরা যদি স্কোরকার্ড লক্ষ্য কর তবে দেখতে পাবে শ্রীলঙ্কার প্রায় কেউই লেগবিফোর হয়ে আউট হয় নি, অথচ ভারতীয় খেলোয়াড়দের পায়ে বল লাগলেই আউট। ওদের কেউ কটবিহাইণ্ড হয় না। সুতরাং ভারতীয়দের বিপক্ষের এগার জন ছাড়া আরও দু'জন আম্পায়ারের বিরুদ্ধে খেলতে হচ্ছে। তবে সিংহলীরা খেলায় অনেক উন্নতি করেছে। ওদের অধিনায়ক অনুরা তেনিকুন-এর মতো খেলোয়াড় খুব অল্পই দেখা যায়। বোলিং ও ফিল্ডিং দুইই ওদের উন্নত ধরনের। কিন্তু আম্পায়ারিং?

প্রথম টেস্টের আম্পায়ারিং-এর নমুনা দিলে বুঝবে ভারতকে কী অবস্থার মধ্যে খেলতে হচ্ছে। আম্পায়ারিং যে কি হবে তা আগের খেলা কোল্টস্ একাদশের বিরুদ্ধে খেলাতেই অধিনায়ক ওয়াদেকর বুঝেছিলেন। তেনিকুন টসে জিতে অল্প স্যাঁতসেতে উইকেটে ব্যাট করতে দেন ভারতকে। প্রথম বলি হল গোপাল বসু। মেভান পেরিসের একটি ইনসুইং বল লেগস্টাম্পের উপর পড়ে, গোপাল পা বাড়িয়ে ফরোয়ার্ড খেলে পায়ে বলটা নেন। কোনো আইন এখনও তৈরি হয় নি, কখনও হবে না যে ওই বলে লেগবিফোর হবে। কিন্তু ফেলসিংগার কল শুনেই হাত তোলেন। গোপাল ছাড়া গাভাসকার, ওয়াডেকর ও ব্রিজেশ প্যাটেল অপূর্ব ক্যাচ ধরার মাধ্যমেই আউট হন। ভারতের তখন চার উইকেটে ৮১। বাঘের মতন খেলছেন অশোক মানকড়, শ্রীলঙ্কার বোলাররা তখন কি করবে! ফেলসিংগার হয়তো মনে মনে বললেন, আমি আছি ভয় কি! অশোক ডান পা বাড়িয়ে উইকেটের বাইরে, পেরিসের বল এসে ওর পায়ে লাগল। হাউজ দ্যাট! ফেলসিংগারের হাত আকাশের দিকে। দ্বিতীয় বলি। ওভাবে মানকড়কে আউট না দিলে কী যে হতো কে জানে! যদিও আশাক শূন্যরানে ও দশের

মাথায় খুব শক্ত চান্স দিয়েছিলেন। একনাথ সোলকার তাঁর চিরকালের লড়াইয়ে খেলা খেলছেন। মিডিয়ম পেসার ও পাথা' লেগ স্টাম্পের বাইরে পিচ পড়ে লেগ কাটার একটি বল এসে সোলকারের ডান প্যাডে কী কুক্ষণেই যে লাগল। ব্যাস হয়ে গেল তৃতীয় বলি। সোলকার ২৫ রানে শেষ হলেন। ভেঙ্কটরাঘবন অপূর্ব খেলছেন। কোনো বোলারই তাঁকে আটকে রাখতে পারছেন না। তাঁর রান তখন ৩৭। অজিত ডিসিলভার একটি বল লেগস্টাম্পের বাইরে বাঁ পা বড়িয়ে সুইপ করতে গিয়ে ফসকান। আর কথা নেই বাঁ পায়ে লাগা মাত্রই হয়ে গেলেন চতুর্থ বলি। একা আলান ফেলসিংগার এইভাবে চারটি উইকেট খেয়ে ২০১ রানে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ করান।

অমুরা তেনিকুন সত্যিই ভালো খেলে ১৩১ রান করেন। সেখানেও ফেলসিংগারের হাত আছে। তেনিকুনের মখন ৪৮ ভেঙ্কটরাঘরনের বলে কটবিহাইণ্ড হন, মাঠশুদ্ধ লোক বুঝতে পারে কিন্তু ফেলসিংগার যে দলের সহায় তাদের আর ভয় কি! এইভাবে কটবিহাইণ্ড হয় না জয়ন্ত সেনেভিরত্নে যে ২৮ রান করে, সেও ৫-এর মাথায় ভেঙ্কটরাঘবনের বলে ক্যাচ দেয়। মেভাস পেরিস ভেঙ্কটের সোজা জোর বল একটি মিডল স্টাম্পের মধ্যে ডান পায়ে লাগে। ফেলসিংগার ভেঙ্কটকে বলেন ওটা বাড়ানো বাঁ পায়ে লেগে এসে ডান পায়ে লেগেছে তাই আউট দিলাম না। সালগাঁওকায়কে তো নো বল ডেকে ডেকে শেষ করে দিল। সালগাঁওকার আম্পায়ারকে জিজ্ঞেস করে কোথায় তার বোলিং-এ গলদ হচ্ছে। ফেলসিংগার নাকি জবাব বলে, বল করে যাও প্রশ্ন করো না। এমনি করে শ্রীলঙ্কা ৩৪২ রান করে ১৪১ রানে এগিয়ে থাকে।

কিন্তু শ্রীলঙ্কার সব আশা ধুইয়ে দেয় গোপাল বসু ও সুনীল গাভাসকার দ্বিতীয় ইনিংসে অনবদ্য ব্যাটিং করে। গোপাল করেন ১০৪, সুনীলের ৮৫। প্রথম দুটির ১৯১ রান একটি রেকর্ড হয়। ন'বছর আগে সারদেশাই ও জয়সীমা করেন ১৫০ রান! গোপাল বসু এই সেঞ্চুরিতে প্রমাণ করেন তাঁর টেস্ট খেলার যোগ্যতা আছে। গোপাল আমাদের মান রেখেছেন।

পরের মাসে দ্বিতীয় টেস্টের কথা ও শ্রীলঙ্কা সফরের অন্যান্য খবর দেব।

হ্যাঁ হায়দ্রাবাদ থেকে কুচবিহার ট্রফি বাংলায় এসেছে। ভারতের পাঁচটি অঞ্চলের স্কুল ক্রিকেটারদের বাৎসরিক প্রতিযোগিতা। ক্রিকেটে পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের প্রাধান্য ক্রমশঃ খর্ব হচ্ছে। অন্যান্য অঞ্চল এগিয়ে আসছে। গত বছরের বিজয়ী দক্ষিণাঞ্চল এবং রানার্স পশ্চিমাঞ্চল দু'দলই এবছর সেমিফাইনালে পরাজিত হল। ফাইনালে উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে খেলায় প্রথম ইনিংসের ফলাফলে ৪৮ রানে পিছিয়ে পড়া সত্ত্বেও অপূর্ব মনোবল ও দলসংহতির পরিচয় দিয়ে পূর্বাঞ্চল ৫ উইকেটে জেতে প্রায় আট দিনের মতো সময় হাতে রেখে। দ্বিতীয় ইনিংসে উত্তরাঞ্চলকে ১৩০ রানে নামিয়ে দেয়। প্রথম ইনিংসে ওরা করে ২৪৯। পূর্বাঞ্চলের এই বিজয়ের মূলে আছে প্রণব রায়, প্রণব নন্দী, উইকেটরক্ষক সৌরব বসু ও বোলার বেঙ্কটরাম জামসেদপুর স্কুলের অফস্পিনার বেঙ্কটরামের জন্যে উত্তরাঞ্চলের দ্বিতীয় ইনিংস অত কম রানে পড়ে। বেঙ্কটরাম ৫০ রানে ৬টি উইকেট পায়। খেলার শেষে হায়দ্রাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের যুক্ত-সম্পাদক এই প্রতিযোগিতার তিন বিভাগে শ্রেষ্ঠ তিনজনকে তিনখানি ব্যাট

উপহার দেন। শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান—পূর্বাঞ্চলের প্রণব রায়; শ্রেষ্ঠ বোলার—উত্তরাঞ্চলের এম্মানুয়েল বেঞ্জুমিন; শ্রেষ্ঠ ফিল্ডার—দক্ষিণাঞ্চলের সন্তোষ কুমার।

বাংলার ফুটবল আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ভাবলেও হৃৎকম্প হয়। ফুটবল ছিল আমাদের গর্ব। তা দিনে দিনে কোথায় লুটিয়ে যে পড়ছে সে আর ভাবা যায় না। সন্তোষ ট্রফিতে হারার পর আরও বিপর্যয় ঘটে গেল। ডুরাণ্ড থেকে বিদায় নিল শক্তিশালী ইষ্টবেঙ্গল। পরাজয় ঘটল কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত জাতীয় জুনিয়র ফুটবলের সেমিফাইনালে ওই কেরলের কাছে। কেরল বেশ এগিয়ে চলেছে। সর্বভারতীয় স্কুল ফুটবল সুব্রত কাপের খেলাতেও বাংলার দুটি স্কুল দলকে হার স্বীকার করতে হল। কলকাতার ফুটবলের দল বদলাবদলির পালা শেষ হয়েছে। বাংলার অস্তমিত ফুটবল কবে আবার সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হবে?

মাঘ মাসের প্রশ্নের জবাব—

১। ১৯৫৩-৫৪ সালে;
২। হিরোজি সাটন, জাপান;
৩। ৬ জন, দু'জন কুস্তিগীর এবং ৪ জন অ্যাথলেটস;
৪। লণ্ডনে ১৯৪৮ সালে;
৫। ১৪ আউন্স।

নতুন প্রশ্ন:

১। মুস্তাক আলী যখন প্রথম টেস্ট খেলেন তখন তাঁর বয়েস কত?

২। অলিম্পিকে কে প্রথম অ্যাথলেটিক সোনার মেডেল পান?

৩। কোন চারজন বালক জাতীয় টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ন হবার পর পরে পুরুষ সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হন?

৪। ট্রিপল জাম্পকে আগে কি বলা হতো?

৫। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে কার ব্যক্তিগত রানসংখ্যা সর্বোচ্চ?

মাঘ মাসে দুটি মারাত্মক ছাপার ভুল হয়েছে। ১১ লাইনে পরে সেটাও 'পেয়েছিলেন' এর জায়গায় 'ছেড়েছিলেন' হবে। ২০ লাইনে 'সবের' জায়গায় 'সারেব্' হবে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমরা বৈশাখ ১৩৮১ থেকে আবার সন্দেশকে আর একটু বড় করবার চেষ্টা করছি। কিন্তু, কাগজের দাম যদি না কমে, তবে সন্দেশের দাম একটু বাড়াতে হবে। তোমরা সবাই চাঁদা পাঠাবার সময় নতুন চাঁদার হার লক্ষ করে দেখো।

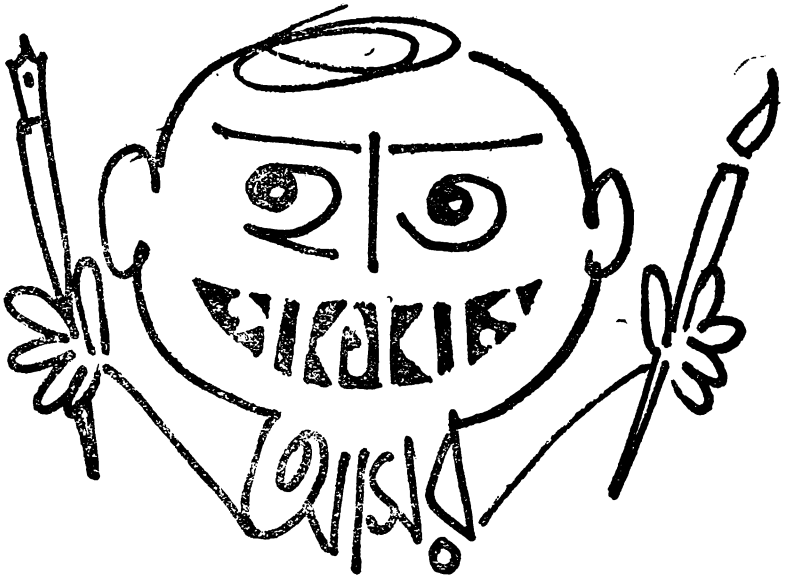

* হাত পাকাবার আসর কেবলমাত্র ১৭ বছরের কম বয়স্ক গ্রাহক-গ্রাহিকাদের জন্য।
* সন্দেশের পছন্দ অনুযায়ী ছড়া, ছবি, গল্প, ধাঁধা ইত্যাদি ছাপানো হয়।
* কাগজের একদিকে পরিষ্কার করে ছাপার জন্য লিখবে।
* ছবি আঁকবার সময় কেবল কালো বা গাঢ় নীল কালি ব্যবহার করবে।
* সন্দেশের গ্রাহক স্কুল লাইব্রেরির ১৭ বৎসরের কম বয়সের ছাত্র/মেম্বাররাও এই আসরে যোগ দিতে পারবে।
* নাম, বয়স ও গ্রাহক নং স্পষ্ট করে লিখবে।

সেই তরুণ বিপ্লবী

শিবাদিত্য দাশগুপ্ত গ্রাহক নং ৮৩৭—বয়স ১৫ বছর

স্বাধীন ভারতের মুক্তাকাশে আমরা ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস পালন করছি। যারা বড় বড় নেতা ছিলেন যেমন গান্ধীজী নেতাজী তাদের কথা স্মরণ করছি। এমন অনেক তরুণ শহীদ আছেন যাঁরা ইতিহাসের পাতায় স্থান পাননি। তাঁদের মহান আত্মত্যাগের কথা কেউ জানে না, কিন্তু তাঁদের বিপ্লবী মন হাজার হাজার যুবকের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগিয়েছিল।

১৯০৯ সালে লণ্ডন শহরে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে। সেই সময় ভারতীয় ছাত্রদের দেখাশুনার ভার ছিল কার্জন উইলির উপরে। তিনি ছিলেন বৃটিশ সরকারের ভারত বিভাগের সেক্রেটারি অফ স্টেটের রাজনৈতিক এ, ডি, সি। তিনি ছাত্রদের দেখাশুনার নাম করে গুপ্তচরের কাজ করতেন। এই কথা ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। শিক্ষাক্ষেত্রে গুপ্তচর প্রথা পরাধীন দেশের ছাত্রদের মনে দাবানল জ্বালিয়ে দিল। এই অন্যায়ের প্রতিবাদের জন্য তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন।

সেদিন ছিল ১লা জুলাই ১৯০৯ সাল, ন্যাশন্যাল এ্যাসোসিয়েশন-এর বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে লণ্ডনের জাহাঙ্গীর হলে নানা শ্রেণীর নরনারীর ভিড় হয়েছিল। সেই জনতার মধ্যে কার্জন উইলিও ছিলেন। তিনি ভিড়ের মধ্যে হেঁটে চলেছেন। হঠাৎ একজন যুবক পিস্তল হাতে দাঁড়ালেন তার সামনে। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল গুলির আওয়াজ। কাছাকাছি যারা ছিলেন মুহূর্তের মধ্যে দেখলেন কার্জন উইলির

রক্তাক্ত দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। তারই সামনে দাঁড়িয়ে পিস্তল হাতে একটি যুবক। অবিলম্বে যুবককে গ্রেপ্তার করা হল।

বিচারের দিন বিচারক তাঁকে বললেন অন্যায় স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে মৃত্যুদণ্ড হবে না।

যুবকটি সদর্পে বললেন, 'আমি কোন অন্যায় করিনি। আমি ক্ষমা চাইব না। আমার ফাঁসী হলে হবে। আমার ফাঁসী হলে আমার মতো লক্ষ লক্ষ ভারতীয় ছাত্রভাই ভারতে চুপ করে আর থাকবে না। আমার মৃত্যুর শোধ তারা তুলবে, আমি তাদের মনে যে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগিয়ে দিলাম, দেখতে দেখতে সমস্ত ভারতে এই বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠবে।' এই বলে যুবকটি হাসি মুখে মৃত্যু আদেশ বরণ করলেন। যুবকটি কে জান? পাঞ্জাবের একটি ছোট গ্রামে তার জন্ম। তার নাম হল মদন লাল ধিংড়া এই যুবকই এদেশে প্রথম ফাঁসীর মঞ্চে ঝুলেছেন।

নূপুর ভট্টাচার্য

গ্রাঃ নং ৩৬৪—বয়স ১৩ বছর

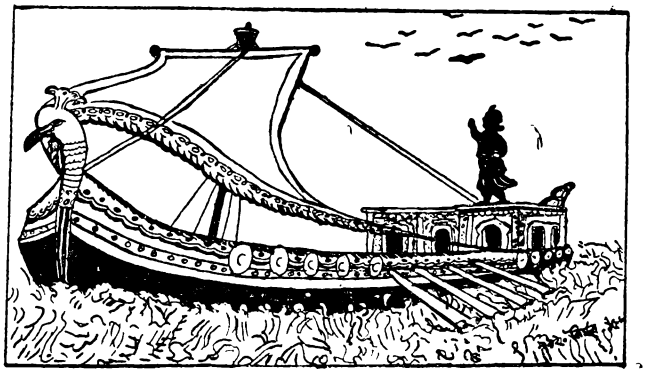

নির্মলকান্তি দত্ত, গ্রাঃ নং ১১২, বয়স ১৫ বছর

"নৌকা চলার গান"

নূপুর ভট্টাচার্য

গ্রাঃ নং ৩৬৪—বয়স ১৩ বছর

নৌকা চলে
নদীর জলে,
ঢেউয়ের মাঝে
সকাল সাঁঝে
পাল খাটিয়ে
হাল বাগিয়ে,
নদীর জলে
নৌকা চলে
সন্‌সনিয়ে
হন্‌হনিয়ে
নৌকা চলে
নদীর বুকে।
মাঘের শীতে
কন্‌কনিয়ে
মাঝিরা গায়
কি কৌতুকে!
সুয্যি মামা
বসেন পাটে,
আঁধার নামে
সাঁঝের হাটে,
গগন তলে
মানিক জ্বলে
নদীর জলে
নৌকা চলে।

সৈনিক

সুনন্দকুমার সান্যাল—গ্রাঃ নং ৫৯৪, বয়স ১৩ বছর ৯ মাস

কতদিন হয়েছি স্বাধীন, তবু মাঝে মাঝে মনে পড়ে,—
হাত থেকে বোমাগুলি শিউলির মতো গেছে ঝরে।
এখনও কানে আসে আহতের কাতর আর্তনাদ,
লোভী হাতদুটো চায় মাঝে মাঝে যেন রক্তের স্বাদ।
এখনও ভোলেনি সে ট্রিগারের সে শীতল ছোঁয়া,
এখনও চোখে ভাসে বিস্ফোরণের তীব্র ধোঁয়া।
সম্মুখে দেখি ছবি, যারা অকাতরে দিয়ে গেছে প্রাণ।
আজও ভাই মনে পড়ে; যেদিন স্বাধীন হলো ভূমি—
আমি করি নাই মাথা নত, করজোড়ে দেবতারে নমি।
নির্ভীক সৈনিক, সঙীনের লাল ফলা নিয়ে
দিয়েছি লাল সেলাম, রক্ত গোলাপ গেঁথে দিয়ে।
আজও ভাবি, 'হয়েছি স্বাধীন,' তবু মাঝে মাঝে মনে পড়ে—
বন্দুক থেকে বুলেটেরা শিউলির মতো গেছে ঝরে।

মধুময় দত্ত
বয়স ৬
মিলনী
নিম্ন
বুনিয়াদী
বিদ্যালয়

গেঁট্টি মামার স্বপ্ন

পার্থ মিত্র—গ্রাহক নং ৭৩৭,
বয়স ১২½ বৎসর

আদ্যি কালের বদ্যি বুড়ো
দেখতে সে নয় মন্দ,
নাকটি তাহার বেজায় বড়
নেইকো তাহার স্কন্ধ।
মুখটা তাহার হাঁড়ির মতো
কানটা তাহার কালা।
গেঁট্টি মামা বলত এসব
করত ঝালাপালা॥
আসলে ভাই এসব কিছু
নয়কো মোটেই সত্যি,
গেঁট্টি মামা স্বপ্ন দেখে,
খায় নি বলে পথ্যি॥

উইলিয়ম শেক্সপীয়র

কৌশিক সেনশর্মা
গ্রাঃ নং ১৩১—বয়স ১২ বছর

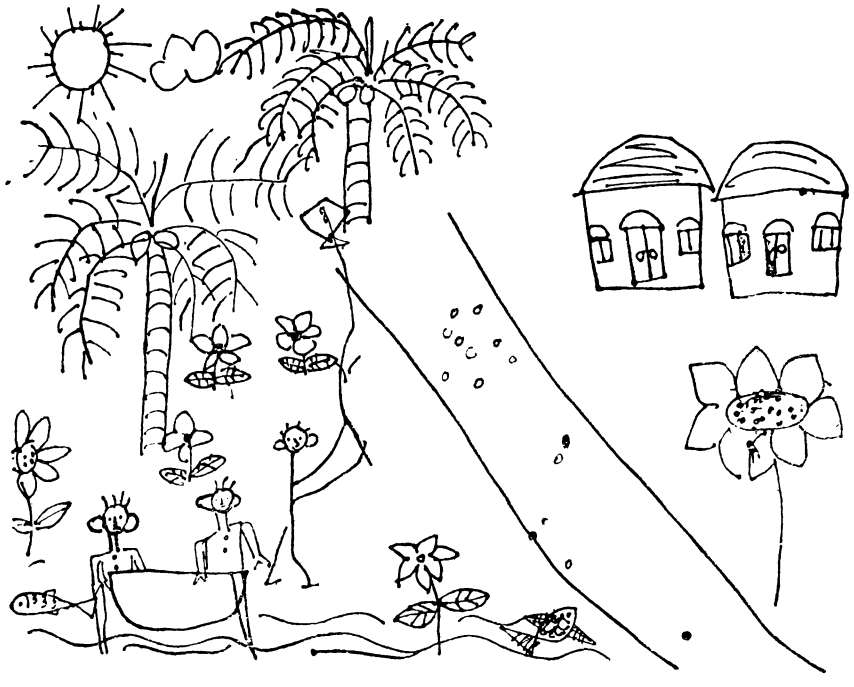

হৈমন্তী ভট্টাচার্য
গ্রাঃ নং ৯৮২
বয়স
৯ বছর

• কর্মফল • কল্লোল ত্রিপাঠী •

গ্রাঃ নং
১১৩৭

বয়স
১৪ বছর

হিরু মজুমদার
বয়স ৯ বছর
মিলনী নিঃ বুঃ
বিদ্যালয়

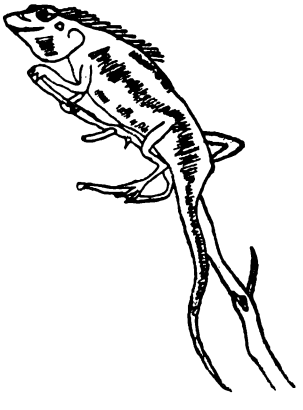

গিরগিটি

প্রিয়দর্শী মুখোপাধ্যায়

গ্রাহক নং ২৬৭, বয়স—১০½ বছর

একদিন ছুটির সকালবেলায় দেখলাম গাছে খুঁটির উপর একটা গিরগিটি বসে আছে। অনেকক্ষণ বসে থাকতে দেখে আমি আমার আঁকার খাতা নিয়ে আঁকতে বসে পড়লাম। প্রথমে আমাকে দেখে গিরগিটিটা বার বার আমার দিকে তাকাতে লাগল। তারপরই ও যেন বুঝতে পারল যে আমি ওরই ছবি আঁকছি; তাই আর নড়াচড়া না করে চুপচাপ খুঁটির উপর বসে রইল। ততক্ষণে আমি ওর ছবি আঁকতে শুরু করে দিলাম। আঁকা শেষ হলে সে দু'বার ঘাড় নেড়ে যেন আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তুর্‌তুর্‌ করে নেমে সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

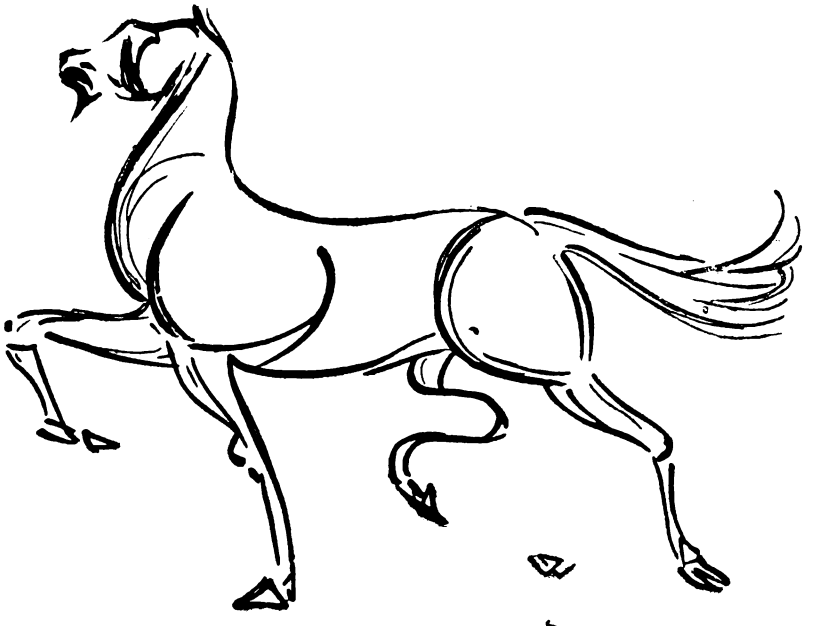

অভিজিৎ বাগচী
গ্রাঃ নং ৬৬২
বয়স ১৫½ বছর

একটা বাঘ

কস্তুরী রায়

গ্রাঃ নং ৮৭৪ বয়স—৭ বছর

একটা বাঘ ছিল সে খুব দুষ্টু। দুষ্টু বাঘ যে বনটায় ছিল সেই বন দিয়ে এক রাজপুত্তুর যাচ্ছিল। তখন বাঘটা বলল "তোমায় খাব"। তখন রাজপুত্তুর বল্ল "তুমি তো খাবেই তার আগে একটা কথা শুনে নাও"। বাঘ বলল "কি কথা?"

"আমার এক ভাই ছিল সে একদিন ঠাকুরের কাছে শাপ পেয়ে বাঘ হয়ে গিয়েছিল", রাজপুত্তুর বলল, "এই আমার কথা"। বাঘ বলল, "ঠাকুর কে?" রাজপুত্তুর বলল, "ঠাকুর হল ভগবান"। বাঘ বলল, "ও বুঝলাম।" বাঘ ভাবল, বাবা! যদি আমায় শাপ দেয়, তাই বলল, "আচ্ছা, খাবনা, যাও।"

"সেই যে আমার নানারঙের দিনগুলি"—

অভিজিৎ চৌধুরী

বয়স-১৩ বছর গ্রাঃ নং ৪৬৯

কলকাতায় জন্মেও জন্মের পরে কলকাতাকে চিনতে পারিনি। কারণ চারিদিক জানবার, চেনবার মতো মন তখনও আমার হয়নি।

মেদিনীপুর—আমার শৈশবের প্রথম অনেকখানি ফেলে এসেছি মেদিনীপুরের খোলা আকাশের নিচে, কাশের দলের পাশে, লাল মাটি আর নুড়িতে। মেদিনীপুরকে চিনেছি ভীষণ ভাবে, তাই আজও স্মৃতির সাগরের অতলে সে হারিয়ে যায়নি। শৈশবের মাঝামাঝি এসে কিন্তু নিজেকে দেখেছি অন্য জায়গায়। তাই মেদিনীপুরকে ছেড়ে আসতে যে বিদায়ের বিষাদ সুর বেজেছিলো তার অনেকখানি মুছে গিয়েছিলো রামপুরহাটের পরিবেশে।

রামপুরহাটের কথা মনে পড়তেই মনে হয় সেই ক্যানার ঝাড়, বাড়ির পাশের মাঠ, ছুটির দিনের বুনো ফুলের বুনো গন্ধ, ছাগল ছানার পিছন পিছন ছোটা আর ছোট খেলার জীপটা নিয়ে নুড়িঢালা রাস্তা ধরে এগোনো। ছেলেবেলায় স্কুলের বিভীষিকা বা আনন্দ যাই হক, আমার মনে দাগ ফেলেনি, তাই বাঁধনহারা পাখির মতো ঘুরে বেড়িয়েছি রামপুরহাটের মাঠে মাঠে তেজপাতা গাছের গন্ধ ছড়িয়েছে ফুরফুরে বাতাসে। সে গন্ধ নিয়েছি বুক ভরে। এলোমেলো ঢিল ছুঁড়েছি পুকুরের জলে। চাতক পাখির মতো চেয়ে থেকেছি পুকুরের জলের দিকে। জলের মৃদু ঢেউ কখনও দোলা দিয়ে গেছে আমার মনে সুর তুলেছে নতুন রঙিন খুসির শরতের হালকা সাদা মেঘ ভেসে এসেছে আকাশে। নতুন সূর্যের আলো এসে পড়েছে চারিদিকে, আর আমার মনে সে আলোয় দেখেছি চারিদিক নতুন করে, অবাক চোখে। অবুঝ মনটা গেছে হারিয়ে।

কলকাতা, আবার কলকাতা। কলকাতার বাইরের খোলা পরিবেশে আমার ছেলেবেলার যে মনটা মেতে উঠেছিল আনন্দে, হেসেছিল খোলা খুসির হাসি, আজ শৈশব আর কৈশোরের মাঝে সেই মনটা যদি এই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারে, তাই বোধহয় কলকাতার হৈচৈ, গোলমাল আর লাভ লোকসানের খাতায় নাম লিখিয়েছি। হারিয়ে এসেছি শৈশবের সেই হাসি খুসি মাখা রঙিন দিনগুলো।

"সাগরের ঢেউ উত্তাল"

কুশল রায়

গ্রাহক নং ৩৬০, বয়স ১১

লঞ্চটা ছেড়ে দিল 'gate way of India' থেকে। লঞ্চে যাত্রীসংখ্যা ত্রিশ হবে। সবাই চলেছে এলিফ্যান্টা গুহাতে। যাত্রীরা আনন্দে ভরপুর। আরব সাগরের শান্ত নীল জলের ওপর দিয়ে চলেছে লঞ্চ। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে ট্রম্বে। অনেক সামুদ্রিক পাখি। সবার কাছেই একটা করে ক্যামেরা। দেখলাম যাত্রীদের মধ্যে আমরাই শুধু বাঙালী, ও আর এক কোনে বসে আছেন এক মাদ্রাজী। ভারতীয় বলতে আমরা ছজন অর্থাৎ মা, বাবা, দিদি, রাঙাদি, জেঠু ও আমি এবং ঐ মাদ্রাজী ভদ্রলোক—মোটমাট সাতজন। আর বাকিরা সবাই বিদেশী। বেশির ভাগ ইংরেজ ও অ্যামেরিকান, দুজন ফ্রেঞ্চ ও তিনজন ইটালী থেকে এসেছেন। আমার পাশে বসে আছেন দুই ইংরেজ বুড়োবুড়ি। আমাদের লঞ্চটার ভাড়া খুব বেশি তাই সব বিদেশী। ঐ দুই ইংরেজ বুড়ো বুড়িকে আমার পাশে দেখে প্রথমটায় একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ইংরেজীতে কথা বলা অভ্যাস নেই। যদি কিছু জিজ্ঞেস করে! বৃদ্ধ ইংরেজ হঠাৎ আমাকে জানালেন জার্নিটা সত্যিই খুব 'প্লেসেন্ট?' আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম তৎক্ষণাৎ। কিন্তু একটু পরেই আমার ভয়টা কেটে গেল। বুড়ো ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা দারুণ মজার। সারাক্ষণ কথা বলেছেন, যখন তখন যা খুসি ছবি তুলছেন। এক ইটালীয় অল্প বয়সী ভদ্রমহিলা দেখলাম মন দিয়ে সব কিছু লক্ষ্য করছেন আর একজন অ্যামেরিকান মহিলা মন দিয়ে ডায়রি লিখছেন। ওঁরা বৃদ্ধের কাণ্ড দেখে একটু বিরক্ত হচ্ছেন। এক ঘণ্টার পথ, এর-মধ্যে এই ইংরেজ ভদ্রলোক একটার পর একটা লভেন্স খেলেন। ওঁর নাম বোধ হয় হেনরি কারণ ওনার স্ত্রী ঐ নামেই ডাকছিলেন। লঞ্চ এলিফ্যান্টা গুহায় পৌছল। নামলাম সবাই। অনেক সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে হয়। দেখলাম বুড়োদের জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ একটা চেয়ারে উঠে বসলে কজন লোক সেটাকে বয়ে নিয়ে যায় গুহাতে। বুড়ো বুড়ি উঠে বসলেন দুটো চেয়ারে। চেয়ারে বসে ভদ্রলোক বললেন যে তিনি অনায়াসে হেঁটে যেতে পারতেন, কিন্তু চেয়ারে চেপে যাওয়ার একটা আলাদা মজা। আমরা অনেক সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলাম। উপরে গিয়ে দেখি বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে আছেন। বৃদ্ধা আমাদের দেখে বললেন 'We are waiting for you' আমরা তখন ওঁদের সঙ্গেই গুহার ভিতরকার দৃশ্য দেখতে চললাম।

এই গুহায় অনেক শিব ঠাকুরের মূর্তি। বৃদ্ধ হেনরি গাইডের বক্তৃতা বেশ মন দিয়ে শুনছিলেন। তিনি

নাকি 'হিন্দু মাইথলজি' সম্পর্কে খুব 'ইন্টারেস্টেড।' আমি লক্ষ্য করছিলাম উনি সব ব্যাপারেই খুব 'ইন্টারেস্টেড', খাওয়ার ব্যাপারেও। আমরা যখন টিফিন ক্যারিয়ার খুলে মিষ্টিটিষ্টি খাচ্ছিলাম, তিনিও এসে আমাদের সঙ্গে ভাগ বসালেন। কারন তিনি বাঙালী খাওয়ায় খুব 'ইন্টারেস্টেড'। তারপর পর পর তিন বোতল কোকাকোলা নিঃশেষ করলেন। কারণ তিনি বলেলন 'Things go better with cocacola.' খাওয়া দাওয়ার পাট শেষ হল। আরও কিছুক্ষণ গুহাটা দেখলাম। মিঃ হেনরি আমাদের অনেক ছবি তুললেন। তারপর ফেরা।

তখন আবার সাগরে জোয়ার এসেছে। লঞ্চটা চলেছে দুলে দুলে। হেনরিও দুলছেন। এক ঘণ্টা পর আমরা Gate way of Indiaতে পৌঁছুব। হঠাৎ দেখি আমাদের পাশে একটা লঞ্চ। এই লঞ্চটা তো বহু পেচনে ছিল। আমাদের পাশে চলে এসেছে!! নিশ্চয় আমাদের লঞ্চটাকে টেক্কা দিতে চাইছে। তখন দুটো লঞ্চে 'Race' শুরু হল। সাগরে জোয়ার। লঞ্চ দুটো গাঁ গাঁ করে ছুটছে। দুই লঞ্চের যাত্রীরাই দারুণ উত্তেজিত। কোনটা জিতবে! উত্তেজনায় অনেকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। চাৎকার করছেন। হেনরির তো কথাই নেই। হেনরি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছেন। হাত পাও ছুঁড়ছেন। দুটো লঞ্চই সমান তালে এগিয়ে চলেছে। তারে ভিড়বার আর বেশি দেরি নেই। এবার আমাদের লঞ্চটা এগিয়ে গেল। দ্বিতীয় লঞ্চটা পেছনে।

লঞ্চ তীরে ভিড়লে আমরা সবাই জয়ের আনন্দ নিয়ে নামলাম। আমাদের জন্য গাড়ি তৈরি ছিল। আমি আর দিদি গাড়িতে উঠবার আগে হেনরি ও তাঁর স্ত্রীর কাছে বিদায় নিতে গেলাম। আমাদের তিনি হাসিমুখে 'গুডবাই' বললেন। তারপর বললেন আবার আমাদের দেখা হবে তিনি আশা করেন। আমরা ফিরে আসতে লাগলাম। হঠাৎ শুনলাম ভেজা গলায় হেনরি বলছেন 'Don't they look like Helen and John?' আমি পেছনে তাকিয়ে দেখি দুজনেরই মুখে বিষাদের কালো ছায়া। তাঁরা পরস্পর বলাবলি করছেন 'God knows where they are. May God bless them'. আমরা গাড়িতে উঠলাম। পেছনে তাকিয়ে হেনরির উদ্দেশে হাত নাড়লাম। হেনরিও স্মিত হাস্যে হাত নাড়লেন।

কান্তা
—সৌরভে
আপনার মনোহরণ করবে

...আমোদিত ক'রে তুলবে আপনার জীবন। হালকা মিষ্টি গন্ধের ছোঁয়ায় এনে দেবে সুখ রোমাঞ্চ। কান্তা আপনাকে ঘিরে রচনা করবে এক সৌরভের জগৎ—মুগ্ধ হবে সকলের মন।

CCKA 5670A

ক্যালকাটা
কেমিক্যালের তৈরী

প্রায় ষাট বছর আগে যেদিন জামসেদপুরে ভারতের প্রথম ইস্পাত কারখানা চালু করা হয় সেদিন থেকে টাটা স্টীল গড়ে তুলেছে স্বয়ম্ভরতার এক অনন্য ঐতিহ্য।

বহু বছর ধরে দেশের এই একমাত্র ইস্পাত কারখানার বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাবার মত সহায়ক শিল্পের অভাবে স্বপ্রয়োজনে যন্ত্রপাতির খুচরো অংশ টাটা স্টীল স্বয়ং তৈরী করতে বাধ্য হয়।

টাটা স্টীল আজও উদ্ভাবন ও নির্মাণ করছে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি—যেমন ল্যারি কার, পুশার কার, পেলেটাইজিং কিলন, মাড গান ও রকিং গিয়ার।

এই ভাবে ভারতকে বৈষয়িক ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভর ক'রে তোলার সহায়তায় ছেষট্টি বছর পূর্বের প্রতিশ্রুতি টাটা স্টীল আজও পূরণ ক'রে চলেছে।

টাটা স্টীল

পরাগ কুমার রায়

গ্রাহক নং ৬৫১—বয়স ৮ বছর

জগদীশ রায়—বয়স ১২ বছর

মন্মথনগর ভবেন্দ্র ফ্রি প্রাঃ স্কুল

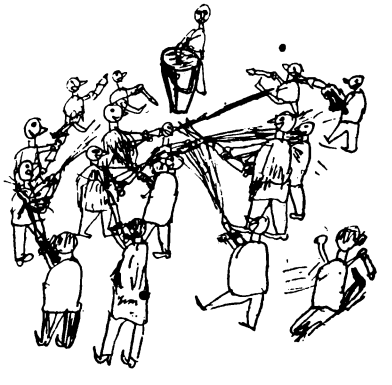

অরূপরতন দরিপা

গ্রাঃ নং ৪৪—বয়স ৮ বছর

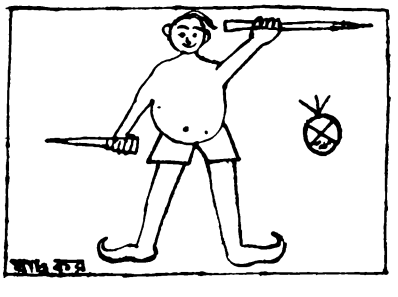

প্রভাত দাস

গ্রাঃ নং ৮৬১—বয়স ৮ বছর

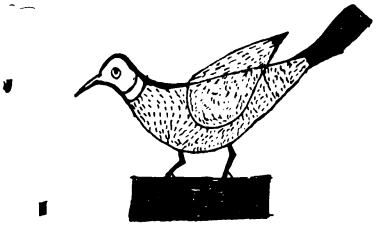

সন্তোষকুমার অধিকারী—বয়স ১০ বছর

মধ্যতারানগর ফ্রি প্রাঃ স্কুল

সন্দেশ-এর নিয়মাবলী

বিশেষ দ্রষ্টব্য—কাগজের অনটন এবং প্রায় আড়াই গুণ মূল্য বৃদ্ধির জন্য ১৩৮১ সালে সন্দেশের সামান্য মূল্যবৃদ্ধি হবে। গ্রাহক গ্রাহিকারা যথাসময়ে বর্ধিতহারে চাঁদা পাঠাও।

(১) যে কোন সময়ে চাঁদা দিয়ে বৈশাখ (মে) অথবা কার্ত্তিক (নভেম্বর) থেকে ছয়মাস বা এক বছরের জন্য গ্রাহক হওয়া যায়।

(২) প্রতি বাংলা মাসের মাঝামাঝি বা ইংরাজি মাসের প্রথমে সন্দেশ প্রকাশিত হবে।

(৩) ইংরাজি মাসের তৃতীয় সপ্তাহেও সন্দেশ না পেলে এবং লিখিতভাবে জানালে ডুপ্লিকেট কপি পাঠানো হবে। ২০ তারিখের আগে লিখলে ডুপ্লিকেট পাঠান হবে না।

(৪) যথাসময়ে অপ্রাপ্তিসংবাদ না জানালে ডুপ্লিকেট দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে, তবে বিশিষ্ট থাকলে, এবং ডাক খরচ ২৫ পয়সা পাঠালে, অথবা নিজে এসে নিয়ে গেলে, দেওয়া হবে।

(৫) সন্দেশের চাঁদা মনিঅর্ডার, নগদ অথবা চেকে পাঠান যায়।

(৬) চেকে টাকা পাঠালে, Sandesh নামে চেক লিখবেন।

(৭) মফঃস্বল ব্যাঙ্কের উপর চেক দিলে ভাঙ্গাবার খরচ অতিরিক্ত ২ টাকা লাগবে।

(৮) সন্দেশের জন্য সমস্ত রচনা ও চিঠিপত্র সম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

(৯) গ্রাহক-গ্রাহিকারা রচনা ধাঁধা প্রতিযোগিতার উত্তর ইত্যাদি পাঠাবার সময়ে গ্রাহক নম্বর, নাম, ঠিকানা ও বয়স স্পষ্ট করে লিখবে। সন্দেশ পাঠাবার সময়ে গ্রাহকের নামের বাঁপাশে গ্রাহক সংখ্যা লিখে দেওয়া হয়। নিজের নাম ঠিকানা লেখা পোস্টকার্ড পাঠালে কার্যালয় থেকেও জানান হয়। যে কোন প্রশ্নের উত্তর তাড়াতাড়ি চাইলে জোড়া পোস্ট কার্ড লিখবে।

(১০) স্কুল, ক্লাব, লাইব্রেরিরা চিঠিপত্র ও ব্যক্তিগত যোগাযোগের সময়ে নিজ নিজ গ্রাহক সংখ্যা অবশ্যই ব্যবহার করবেন। যাঁরা ব্লক মারফত সন্দেশ পান, জেলার, স্কুলের নাম এবং ব্লকের নাম দেবেন। ব্যক্তিগত উত্তর চাইলে জোড়া পোস্টকার্ড ব্যবহার করবেন।

(১১) পাঁচ কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। শতকরা দশ কপি পর্যন্ত ফেরত নেওয়া হবে। আমরা নিজ খরচে এজেন্টের নিকট পত্রিকা পাঠাব, কিন্তু ফেরত দেবার ডাক খরচ এজেন্টকে দিতে হবে।

(১২) বাংলা মাসের ২০ তারিখের মধ্যে পরবর্তী মাসের বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি ও ব্লক বিজ্ঞাপন দাতারা সন্দেশ কার্যালয়ে পাঠিয়ে দেবেন।

(১৩) অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পত্র দ্বারা জেনে নেবেন।

সন্দেশ কার্যালয়
১৭২/৩, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলিকাতা-২৯
(ত্রিকোণ পার্কের দক্ষিণে)
ফোন—৪৬-৪৯১৯

'নিউস্ক্রিপ্ট'
এ-১৪, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট
কলিকাতা-১২

কালিকা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড ২৭ ডি. এল. রায় স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত
সন্দেশ কার্যালয় রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা—২৯
হইতে দাশ কর্তৃক প্রকাশিত।